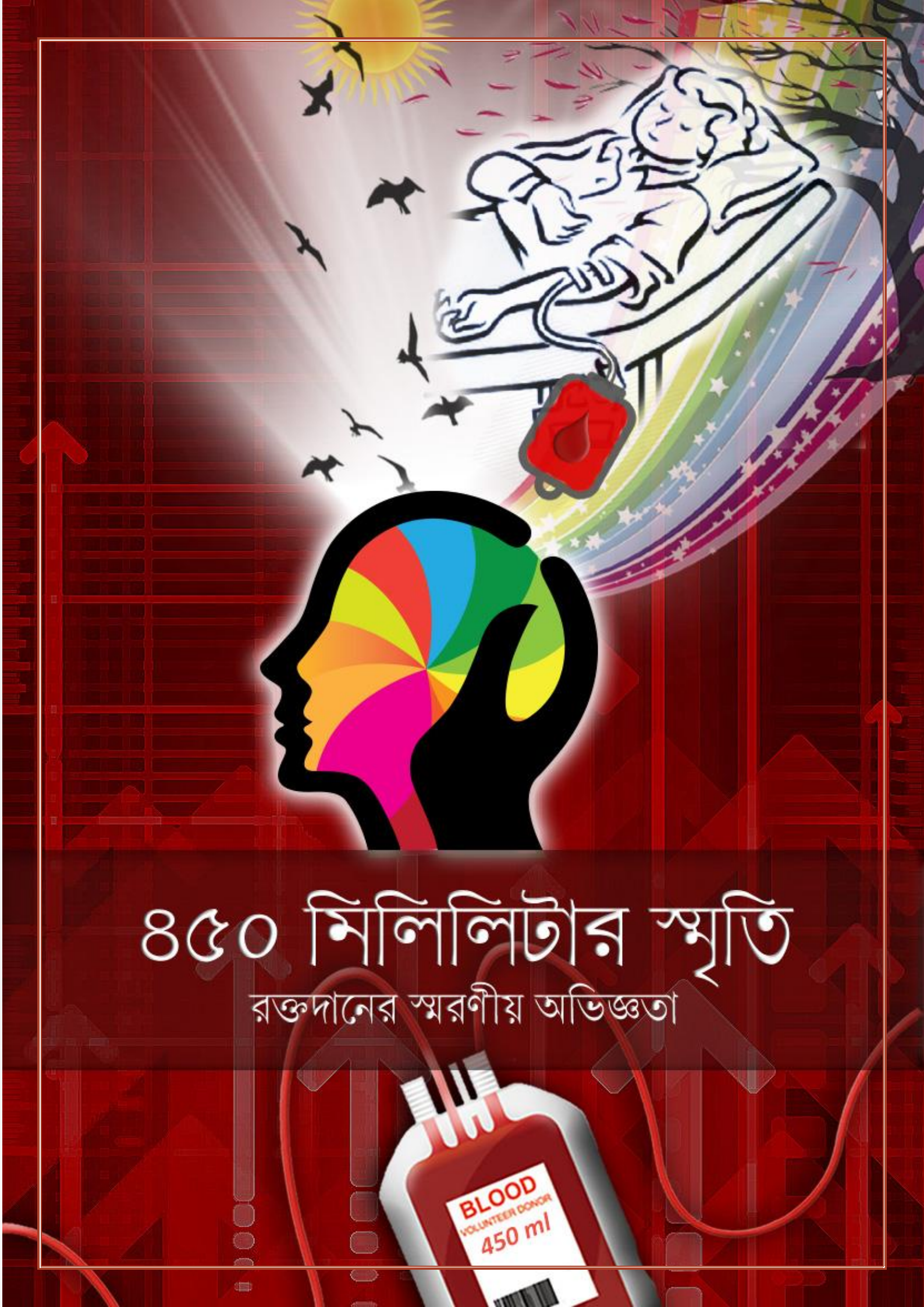
৪৫০ মিলিলিটার স্মৃতি
রক্তদানের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা
BLOOD
VOLUNTEER DONOR
450 ml

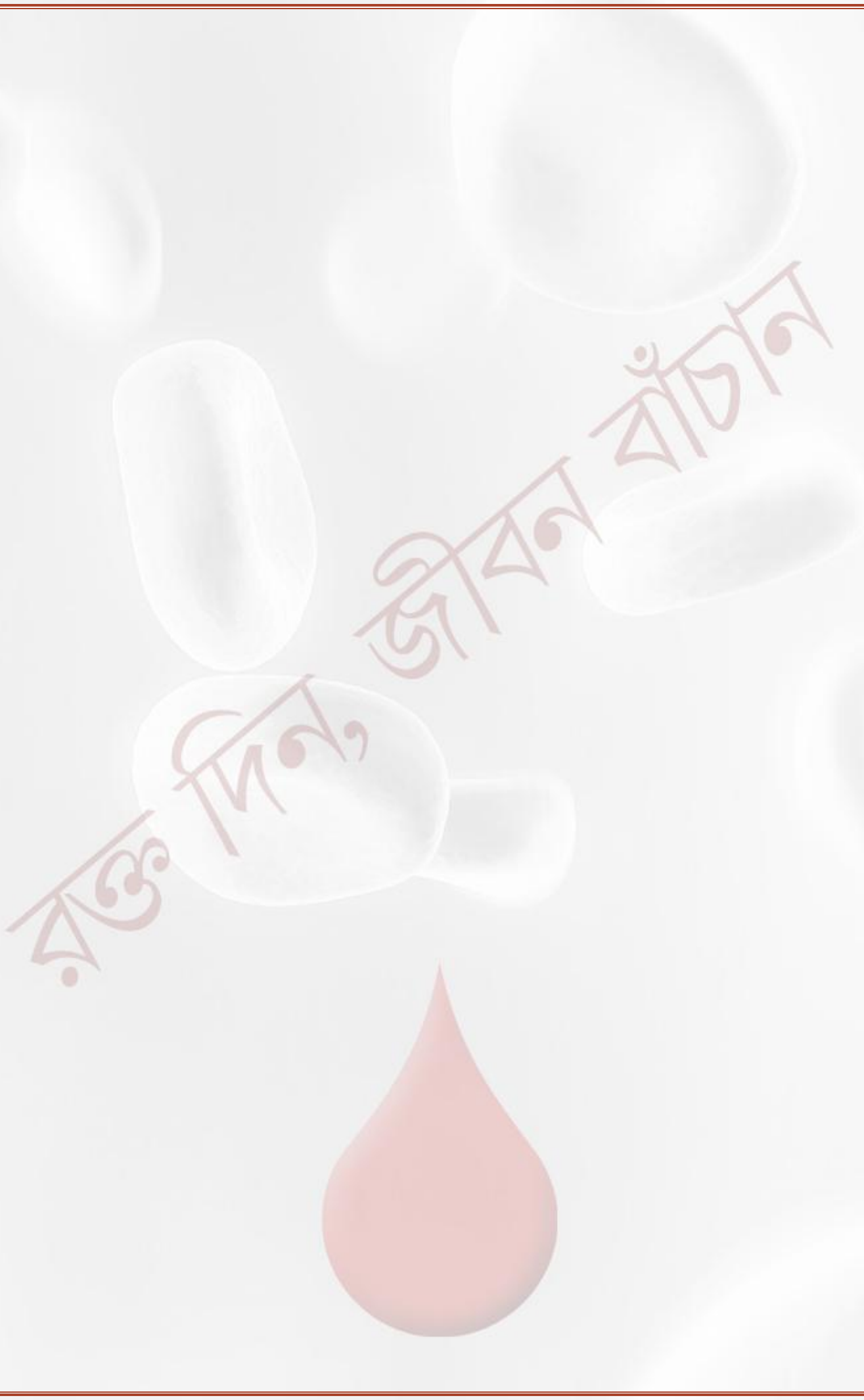
রক্ত দিন জীবন বাঁচান

পূর্বকথা

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। একুশে বই মেলায় ঘুড়ে এলাম। হাজারো-লক্ষ বইয়ের ভিড়ে রক্তদান সম্পর্কিত কোন বই খুঁজে পেলাম না। রক্তদানে মানুষকে উৎসাহিতকরণে বইয়ের ভূমিকা অসীম। একুশে বই মেলায়ও এমন কিছু থাকা জরুরী বলে আমি মনে করি।

যেহেতু আমাদের ক্ষমতা সীমিত, সেই সীমিত ক্ষমতা দিয়েই অনলাইন বই / ই-বুক বানানোর প্ল্যান করি। সকল রক্তদাতাদের সহযোগিতায় প্রথম রক্তদানের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাছাইকৃত ১০০টি অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রকাশ করি '[এক ব্যাগ মানবতা]'। প্রত্যাশা থেকেও অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেই বইটি। রক্তদাতাদের আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো অসংখ্য মানুষকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বইটির দ্বিতীয় পর্ব হিসাবে ২০১৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হল '৪৫০ মিলিলিটার স্মৃতি' যেখানে রয়েছে রক্তদাতাদের রক্তদানের স্মরণীয় স্মৃতি।

এই বইটির পেছনের সকল কারিগরদের আমি আমার মনের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।

- সুব্রত দেব (sHuvo Whtevr)
২১.০২.২০১৭

উৎসর্গ

- নিজের মূল্যবান সময়
- যাতায়াতের কষ্ট
- যাতায়াত খরচ
- মোবাইলের খরচ
- সূচ ফোটানোর ব্যাথা
- নিজের শরীরের মহামূল্যবান ১ ব্যাগ রক্ত

সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করে একজন রক্তদাতা রক্তদান করেন একজন মুমূর্ষু রোগীকে। বিনিময়ে কিছু পাবার আশায় নয়, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে।

"মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য" - হ্যাঁ, মানবতার শ্রেষ্ঠ উদাহরন হলেন এই রক্তদাতারা।

এই বইটি পৃথিবীর সকল রক্তদাতাদের উৎসর্গ করা হল।

উদ্দেশ্য

রক্তদানের অভিজ্ঞতা সকল রক্তদাতাদের জন্য এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। হাসি, কান্না, দুঃখ, আনন্দের মিশ্রিত এক অনুভূতি। এর মাঝে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা সারা জীবনে ধরে লালন করে থাকেন রক্তদাতারা। এই বইয়ে এমন কিছু অভিজ্ঞতাই তুলে ধরা হয়েছে।

আশা করি রক্তদানে মানুষকে আগ্রহী করতে এই বই বিশেষ ভুমিকা পালন করবে।

হ্যাপি ব্লাড ডোনেটিং।

– সুব্রত দেব (sHuvo Whtevr)

সূচিপত্র

বিস্তারিত অভিজ্ঞতা পড়তে হলে রক্তদাতাদের নামে ক্লিক করুন

শহীদুল সারোয়ার সোহেল

Shajedul Islam Saju

Nazrul Islam

Emtiaz Rahman

মোঃফয়সাল হোসেন

Mehedi H Sajjad

রাকিবুল হাসান রাসেল

Tamzid Zubaer

মোশাররফ হোসেন

RH Arnob

Sukh Sahara

Kazi Hakim

Akmal Rawi

Masum Bhuiyan

রংহীন রংধনু

Muhammad Hossain Shobuj

Odhora Khan Chaity

Porag Miazee

মশিউর মিম

Roni CH

Afia Mubasshira Momi

Asraf Himal

Arif Gifari

Anamul Haque

Rifat Hossain

মাহমুদুল হাসান রিয়াদ

Mominul Islam Hridoy

Mahfuz Mahtab

মাহদী হাসান খান চিশতী

Emtiaz Ahmed Emu

Salina Akter

Md Younus

Sabbir Shovon

Tahedul Bashar Farhad

Shuvro

Sabit Mahmud

SB Prio

Rasel Khan Niloy

Omar Bin Kasim Sefat

Emplesis Bibek Nazim

Himel Maruf

Mohiuddin Mohim

Md Yousuf Emtiaz Zisan

Mahmud Khan

Jobayer Bin Amin

Md Rabiulla Somun

Kobi Nurul

মোস্তাকিম সায়মন

Sujon Islam

Mudassar Ahamed Dpi

রক্তদাতাঃ শহীদুল সারোয়ার সোহেল অভিজ্ঞতাঃ ১ (সূচিপত্র)

"তুমি মানুষ, আমিও মানুষ"

সেপ্টেম্বর ২০১৪, ৮ম রক্তদানের অপেক্ষায় ছিলাম। মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের বাজারের এক ব্যবসায়ী তার এক নিকট আত্মীয়ের নবজাতক শিশুর জন্য এ পজেটিভ রক্তের প্রয়োজনের কথা আমাকে জানালেন। নবজাতক শিশুর রক্তের প্রয়োজনের কথা শুনে বুকের ভেতরে চিনচিনে একটা ব্যাথা অনুভব করলাম। এই ফুলটিকে মুকুলে ঝরে পরতে দেয়া যায় না। আল্লাহপাক আমার চেষ্টায় যা রেখেছেন, আমি আমার সেরাটাই করবো বলে মনস্থির করলাম। আর যে ব্যাপারটাকে আমি সর্বাধিক গুরুত্ব দিলাম তা হলো, সেই শিশুটি সনাতন ধর্মাবলম্বী আর আমি মুসলিম। সর্বোপরি আমরা মানুষ। ১৬-০৯-২০২৪ তারিখে মাত্র ১৪ দিন বয়সে আমি তাকে ১ম রক্তদান করি। সে তখন সেন্ট্রাল হসপিটাল ধানমণ্ডির এন-আই-সি-ইউ তে ভর্তি। যেহেতু ১৪ দিনের শিশু, সেহেতু তার মাত্র ৩৫মিলিমিটার রক্ত লাগতো। সেই অবস্থায় শিশুটির মায়ের মুখের দিকে তাকাবার সাহস আমার হচ্ছিলো না। আমি নিজেও খুবই ভঁয়ে ছিলাম। না জানি, কখন কোন দুঃসংবাদ আমাকে শুনতে হয়! ভয়কে আড়াল করে আমি সর্বাত্বকভাবে শিশুটির রক্তের প্রয়োজন মিটিয়ে যাবার অঙ্গীকার করে এলাম। আমার আশাব্যাঞ্জক কথায় শিশুটির পরিবার মনে সাহস পেলো।

২২-০৯-২০১৪ তারিখে আমি ২য় বারের মত তাকে আবারও ৩৫মিলিমিটার রক্তদান করি। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম, তার শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। মনে প্রাণে কেবল আল্লাহকেই ডাকতে লাগলাম। বাচ্চাটার সুস্থতা কামনা করলাম।

২৫-০৯-২০১৪ তারিখে আমি ৩য় বারের মত তাকে ঐ একই পরিমাণ রক্তদান করি। তখনও তার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত। চিকিৎসা ব্যায়বহুল হওয়াতে হাসপাতালের খরচ কুলাতে না পেরে বাচ্চাটার পরিবার বাচ্চাটাকে হাসপাতালের এন-আই-সি-ইউতে রেখে তারা ঢাকার খিলক্ষেতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছে। খুব সকালে এসে সারাদিন হাসপাতালে থেকে রাত ১০টায় বাসায় ফিরতেন বাচ্চাটার মা এবং ফুপু। এই ঘটনার ৩দিন পর বাচ্চাটার ফুপু আমাকে ফোন দিয়ে জানালেন যে "মামা, আমার ভাতিজার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাকে এন-আই-সি-ইউ থেকে বেডে ট্রান্সফার করা হয়েছে। দোয়া করবেন"। এমন সুসংবাদ শুনে মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। আমার পরিশ্রম স্বার্থক। সে এবার সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরলো বলে।

০২-১০-২০১৪ তারিখ দুপুরে বাচ্চাটার মা আমাকে ফোন দিলেন। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললেন "মামা আমার বাবাটার অবস্থা খুব একটা ভালো না। দ্রুত রক্ত দরকার। আপনি একটু আসবেন"?

আমি দ্রুত টঙ্গী থেকে ধানমণ্ডির পথে রওনা হয়ে যাই। হাসপাতালে পৌঁছে দেখি তার মা এন-আই-সি-ইউর সামনে অপেক্ষা করছে। আমি দ্রুত আবারও ঐ একই পরিমাণ রক্তদান করলাম। বার বার মনে হচ্ছিলো, এখানেই বুঝি সব শেষ। বাচ্চাটা বোধ হয় আর..... উহ, আমি আর ভাবতে পারছি না।

১৬ দিনের ভেতর আমি ৪বার রক্তদানসহ একবার স্ক্রিনিং করিয়েছিলাম। আমার দুই হাতের ভেইনে ৫বার সিরিঞ্জের সুই ফুটেছে। প্রতিবারের ব্যাথাটা কম না। নিজের কষ্ট আমার কাছে কষ্ট মনে হবে না, যদি বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে তার মায়ের কোলে ফিরে।

০৬-১০-২০১৪, ঈদুল আযহার দিন। কুরবানীর যাবতীয় কাজ নিয়ে আমি ভীষণ ব্যাস্ত। গরুর রক্তে আমার পোশাক ভিজে আছে, সেই সাথে ঘামের গন্ধে নিজেরই বমি আসছে। সারাদিনে খাবার বলতে এক পেয়ালা সাবুর পায়েস আর এক গ্লাস পানি। গোসল করে ফ্রেশ হবার সময় পাই নাই। বিকেল বেলায় বাচ্চাটার বাবার ফোন "মামা, আমার বাচ্চাটার জন্য আজ আবার রক্ত লাগবে। আপনি আসতে পারবেন"? বুঝতেই পারছি, নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই। হাসপাতাল চেঞ্জ করে বাচ্চাটা এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ২২১ নাম্বার ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। টঙ্গী থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ। পথটা কম না। ঢাকার এপার আর ওপার। ঐ অবস্থাতেই আমি রওনা হয়ে গেলাম। কিছু না খেয়ে যাওয়াতে বাবা আমার উপর ভীষণ রাগ করলেন। নিজেকে এই ভেবে বুঝালাম যে, "কুরবানী মানে ত্যাগ। ইহা কেবল পশুর রক্ত প্রবাহিত করার মাঝে সীমাবদ্ধ না। মানবতার প্রয়োজনে নিজের রক্তও প্রবাহিত করতে হয়"। আজ আমার সামনে সেই সময় উপস্থিত। বাস্তব কাজের দ্বারা ত্যাগের মহান শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

হাসপাতাল পৌছাতে পৌছাতে সন্ধ্যা ৭টা। ২২১ নাম্বার ওয়ার্ডে যেতেই বাচ্চাটার বাবা আমার দিকে এগিয়ে এলেন। পাশেই তার মা দীপা সাহা দাঁড়ানো। এর আগে আমি বাচ্চাটাকে ৪বার রক্তদান করলেও তারা বাবা রিপন সাহার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি রিপন মামাকে বললাম, কেমন আছেন, মামা? (রিপন মামা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিলেন) - আমাকে ক্ষমা করে দেন মামা। আপনার উৎসবের দিনে আমি আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেললাম। (আড়ালে বাচ্চাটার মা কান্না করছে)
আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, এমন কথা বলছেন কেন, মামা? চিন্তা করবেন না। ইনশাল্লাহ, আপনার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠবে।

ঈদের দিন হওয়াতে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সংখ্যা কম ছিল। রক্তদান করে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ১০টা। রিপন মামা নিজে আমাকে আমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। (উল্লেখ্য যে, সেদিনই ছিল আমার সর্বাধিক কষ্টকর রক্তদানের অভিজ্ঞতা)

ঈদের সপ্তাহখানেক পর বাচ্চাটার ফুপু আমাকে ফোন দিয়ে জানালেন যে "মামা সুসংবাদ আছে। আপনার পরিশ্রম স্বার্থক। আমাদের দেবাশীষ হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেয়েছে। সে এখন বাসায় আছে"। শুনে আনন্দে মনটা ভরে গেলো। মহান আল্লাহপাক আমার দোয়া কবুল করেছেন। (উল্লেখ্য যে, ততদিনে বাচ্চাটার নাম রাখা হয়েছে দেবাশীষ সাহা।)

১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫, দেবাশীষের অন্ন প্রসন্ন অনুষ্ঠান। দেবাশীষের বাবার বিশেষ অনুরোধ, আমাকে সেই অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। তার আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে দেখতে চেয়েছেন। শত ব্যাস্ততার মাঝে আমি ঢাকা থেকে নরসিংদী গেলাম, দেবাশীষের পরিবার পরিজনদের সাথে দেখা করার জন্য। তাদের ভালোবাসা আর আন্তরিকতায় আমি সত্যি মুগ্ধ। দেবাশীষকে নিজ কোলে নিয়ে আমি অন্যরকম একটা আনন্দ অনুভব করলাম। বেঁচে থাকলে, একদিন আমারও বার্ধক্য আসবে। আমি রক্তদানের যোগ্যতা হারাবো। সেদিন দেবাশীষ আমার পাশে এসে দাঁড়াবে আর শুনিয়ে যাবে, আমার এই রক্তদানের কথা। (দেবাশীষের এখন আড়াই বৎসর বয়স। বেশ দুরন্ত হয়েছে সে। তার বাবা রিপন সাহা এখনও আমার খোঁজ খবর নেন নিয়মিত। আমার দেখামতে দেবাশীষের বাবা একজন আদর্শ বাবা।)

রক্তদাতাঃ Shajedul Islam Saju অভিজ্ঞতাঃ ২ (সূচিপত্র)

২০০৩-০৪ সেশনে বুয়েটে ভর্তি হওয়ার পর কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বাঁধনের সাথে একাকার হয়েছিলাম। বাধন হলো বুয়েটের রক্তদান করার একটি সংস্থা। ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারাই পরিচালিত। সদ্য ইউনিভার্সিটিতে এসেছি। নানা রকম কৌতুহল চোখে মুখে। প্রতি ৩/৪ মাসে অন্তত রক্তদানের মত মহৎ একটা কাজে নেমে গেলাম।

আমি ১ম বর্ষের দ্বিতীয় সেমিষ্টারে তখন (২০০৪ সাল)। আমার বন্ধু মাহফুজের অনুরোধে মহাখালী বক্ষ ব্যাধি হাসপাতালে রক্তদান করার জন্য আসলাম। রক্ত নেওয়ার সময় সকাল ১১:৩০। সকালে নাস্তা খেয়েই দৌড়ে চলে গিয়েছি। রক্ত গ্রহীতা হলো মাহফুজের খুব কাছের একজন বন্ধুর ছোটভাই। সময় গড়িয়ে ১ টা বেজে চলেছে। মেজাজ ও বিগড়ে যাচ্ছে। মাহফুজকে ফোন করে খুব করে গালি দিয়েছি। অনেক খারাপ কথাও বললাম। কেন রক্ত নিচ্ছেনা বুঝছিনা। একবার ভেবেই নিয়েছি, যাহ! দিবোই না রক্ত। এভাবে বসিয়ে রাখার মানে হয়না।

বেলা ১:৩০ টার দিকে মাহফুজ জুস আর পানি হাতে দৌড়িয়ে আসল। চল, রক্ত দিতে হবে বলে মুচকি হাসল। কটমট চোখে তাকিয়ে বললাম, চল যাই।

রক্ত দিলাম। রক্ত দান শেষে পানি আর জুস খেয়ে বসে আছি। বয়স প্রায় ৫০ হবে, কাচা পাকা চুল দাড়ি শীর্ণ দেহের এক লোক আমাকে রক্তদান করার জন্য ধন্যবাদ জানাল। এরও মিনিট দশেক পরে লোকটি হাউমাউ করে একটি বালতির সামনে বসে কাঁদছিল। বালতিটি ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। সাথে কিছু বরফ আর তাতে পলিথিন দিয়ে মোড়ানো হাত অথবা পা ছিল। আমার শরীর কাপছিল। মাহফুজকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা যাকে রক্ত দিলাম তার কি সমস্যা ছিল"? ও উত্তর দিল ছেলেটির পায়ে টিউমার ছিল। সেখান থেকে ক্যান্সারের উৎপত্তি। তাই পা কেটে ফেলেছে। আমি আর কিছু শুনতে পাইনি। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। প্রচন্ড কষ্টে আমার চোখ টলমল করছিল। কিছুক্ষণ আগে দেওয়া গালি ও বকা গুলো মনের মধ্যে দাগ কাটল। "আসি" বলে পা বাড়ালাম। দু' চোখ বেয়ে পানি পড়ল। মনে হচ্ছিল ঐ পরিবারটি আমারই। স্রষ্টার কাছে ছেলেটি ও তার পরিবারের জন্য দোয়া করে ফিরে এসেছিলাম।

রক্তদাতাঃ Nazrul Islam অভিজ্ঞতাঃ ৩ (সূচিপত্র)

সেটা ছিল আমার ২য় রক্তদান - ২০০০ সালের মার্চের কথা।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ অফিসে রক্তের রিকুয়েস্ট এসেছিল। সাথে সাথে আমি রাজি হয়ে গেলাম, কারন এর আগের বার ১৮তম জন্মদিনে ঢাকা মেডিকেলের সন্ধানীতে গিয়ে রক্ত দিয়েছিলাম, সুতরাং আমার রক্ত কার শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে - বুঝার কোন উপায় নেই। কিন্তু এবার আমার এলাকার এক মায়ের জন্য লাগবে। কিন্তু যেতে হবে পাশের জেলা বি-বাড়িয়াতে।

যাই হোক, রোগীর ছেলের কথা মত আমি পরদিন সকাল নয়টায় গিয়ে উপস্থিত হলাম তাদের বাড়িতে। গিয়ে দেখি- তারা পুরা ফ্যামিলি আমার সাথে যাবে বড় এক মাইক্রো করে। আর রোগীর ছেলে তাদের বাড়ির আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে একে একে আমার সাথে- আব্বা, নানু, দাদু- এই ছেলেটা আম্মাকে রক্ত দিবে। আর সবাই আমার মাথায় হাত দিয়ে দুয়া করে দিচ্ছে আর খুব সম্মানের সাথে কথা বলছে। ভাবখানা এমন যেন- আমি এই বাড়ির নতুন জামাই। আর মহিলারা আমাকে কে কী খাওয়াবে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি যতই বলি- আমি খেয়ে এসেছি, তাড়াতাড়ি চলেন হাসপাতালে যাই। মহিলারা ততই বলতে লাগল- আরে বাজান, তোমার এই চিকনা শরীর থেকে রক্ত নিবে, খেয়ে একটু তাজা হয়ে নাও। এভাবে একেকজনের অনুরোধের ঢেকিঁ গিলতে গিলতে অল্প অল্প করে খেতে খেতে মাইক্রোতে করে বরযাত্রার মত করে রওনা হলাম। গাড়িতেও এই অত্যাচার বহাল থাকল পানি, স্যালাইন, ম্যাংগো জুস, ডাব আর কোকের মাধ্যমে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা বি-বাড়িয়া সদর হাসপাতালে পৌছেঁ গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আরেক লংকা-কান্ড! রোগীর বৃদ্ধা মা হাসপাতালের করিডোরে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্নাকাটি। আর কান্না খুব সংক্রামক জিনিস, আর সবার সাথে সাথে আমার চোখেও পানি এসে গেল। তাড়াতাড়ি প্রস্রাবের বাহানা দিয়ে বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়েঁ ফ্রেশ হয়ে আসলাম। তারপর প্যাথলজি থেকে আমার ডাক আসল- ব্লাড গ্রুপিং, ক্রস-ম্যাচিং আর স্ক্রিনিং এর জন্য ব্লাডের স্যাম্পল দিতে হবে। দিয়ে আসলাম, যদিও গ্রুপ আগেই জানতাম এ পজিটিভ- তবু এখানে নাকি করতেই হবে। এর মাঝে জানলাম- রোগীর জরায়ু অপারেশন করবে, ব্লিডিং নাকি বন্ধ হচ্ছে না। তাই জরায়ু কেটে ফেলে দিতে হবে। উনারা নাকি ৪-৫ দিন ধরে রক্তদাতা খুজতেছেঁ, কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না।

তারপর আসল চূড়ান্ত ডাক- আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম রক্তদানের বেডে। মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে লাল রঙের ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে গেল রক্তের ব্যাগ। তারপর সবাই মিলে আবার এসে গাড়িতে উঠলাম- এবার তাদের অনুরোধ লাঞ্চ করে যেতে হবে। সকালে কি না কি খেয়েছি- তারা সন্তুষ্ট হতে পারে নাই, তাই লাঞ্চ না করে যেতেই দিবে না। আমি বেচারা কি আর করব- পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

রক্তদাতাঃ Emtiaz Rahman অভিজ্ঞতাঃ ৪ (সূচিপত্র)

রক্তদানের স্মরণীয় ঘটনা ২০১০ সালে প্রথম রক্তদানের শুরু। ২০১৭ তে এসে আজ যখন রক্তদানের স্মরণীয় ঘটনা লিখতে বসছি তখন নিজেকে একটু দ্বিধান্বিত মনে হচ্ছে। ২৩ বার রক্তদানের প্রতিটি ঘটনাই আমার কাছে স্মরণীয়। ভালো খারাপ মিলিয়ে সবগুলো অভিজ্ঞতা আমাকে উৎসাহ দেয় প্রতি চার মাস পরে পরে রক্তদানে।

গত মাসের ২২ তারিখের ঘটনা। আমার অফিস শুরু হয় সাড়ে সাতটা থেকে। ঘুম থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে উঠতে হয়। গত বাইশে অক্টোবর ভার্সিটিতে ছিলাম। অফিস থেকে এসে খেয়ে দেয়ে ১০টার দিকে ঘুমিয়েছিলাম। সাড়ে বারোটার দিকে একটা ফোন আসলো। এক মহিলার বাবু হইছে রাত আঁটটার সময়। কিন্তু বাচ্চার এতো বেশি জন্ডিস ছিল ডাক্তার বলছে খুব দ্রুত রক্ত না দিলে বাঁচানো যাবেনা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সাড়ে বারোটার সময় আমাকে ফোন দিলেন ঐ বাচ্চার বাবা। ঘুম থেকে উঠে ঢুলুঢুলু চোখেই রওনা হলাম এক বন্ধু কে সাথে নিয়ে ।

অত রাতে জাহাঙ্গীরনগর থেকে ঢাকায় যাওয়ার গাড়ি পেতে অনেক সময় লেগে গেলো। অবশেষে গাবতলি পর্যন্ত একটা বাস পেলাম। গাবতলি নেমে অবশ্য সিএনজি পেতে খুব বেশি কষ্ট হয়নি। ধানমণ্ডি সেন্ট্রাল হসপিটালে যখন আসলাম রাত তখন ২টা। সকালে আবার অফিস আছে তাই দেরি করতে পারলাম না। রক্ত দিয়ে বের হইছি যখন তখন রাত তিনটা। একটা সিএনজি নিয়ে আবার গাবতলি গেলাম। সেখানে গাড়ির জন্য অনেক সময় অপেক্ষা করতে হল। অবশেসে পত্রিকা বহনকারী একটা পিকাপে করে ভোরের দিকে জাহাঙ্গীরনগর যেতে পারছিলাম।

আরেকটা ঘটনা বলি।

২০১০ সালের ঘটনা। শ্যামলীর একটা হসপিটালে প্রথমবারের মত রক্তদান করতে যাই। রোগীর লোকের সাথে দেখা হওয়ার পর উনি আমাকে রোগীর কাছে নিয়ে গেলেন। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর ভদ্রলোকের সাথে আমার কথোপকথন ছিল এমন রোগীঃ বাবা তুমি আমাকে রক্ত দিতে আসছ আমি খুব খুশি হইছি। কিন্তু বাবা আমি তোমাকে বিনিময় কিছু দিতে পারবো না। আমিঃ কিছু না দিলে তো হবে না! আমি বিনিময় ছাড়া রক্ত দিবো না। রক্তদানের বিনিময় আমার জন্য অবশ্যই দোয়া করতে হবে। আর কিছুর দরকার নেই। ভদ্রলোক আমার এই কথার কোন উত্তর দেননি ঠিকই কিন্তু তার কাঁচা পাকা দাড়ি বেয়ে নেমে আসা চোখের পানি কিন্তু ঠিকই আমি দেখেছি। উনি সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে ই যোগাযোগ করতেন। অনেকবার ওনাদের বাড়িতে যেতে অনুরধ করেছেন। কিন্তু ব্যাস্থতার কারনে যাওয়া হয়নি কখনো।

২০১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি উনি আমাকে ফোন করেছিলেন। বললেন– "ভাষা সৈনিকরা ভাষার জন্য এই দিনে রক্ত দিয়েছিলেন তাই সারা দেশের মানুষ শ্রদ্ধার সাথে এই দিনে তাদের স্মরণ করে। তুমি আমার জন্য রক্ত দিয়েছো। আমি তোমাকেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি" এই কথাটা আমার জন্য শুধু সম্মানেরই না বরং বাকি জীবনে যতদিন সুস্থ থাকবো ততদিন রক্তদানের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। রক্তদিন, জীবন বাঁচান।

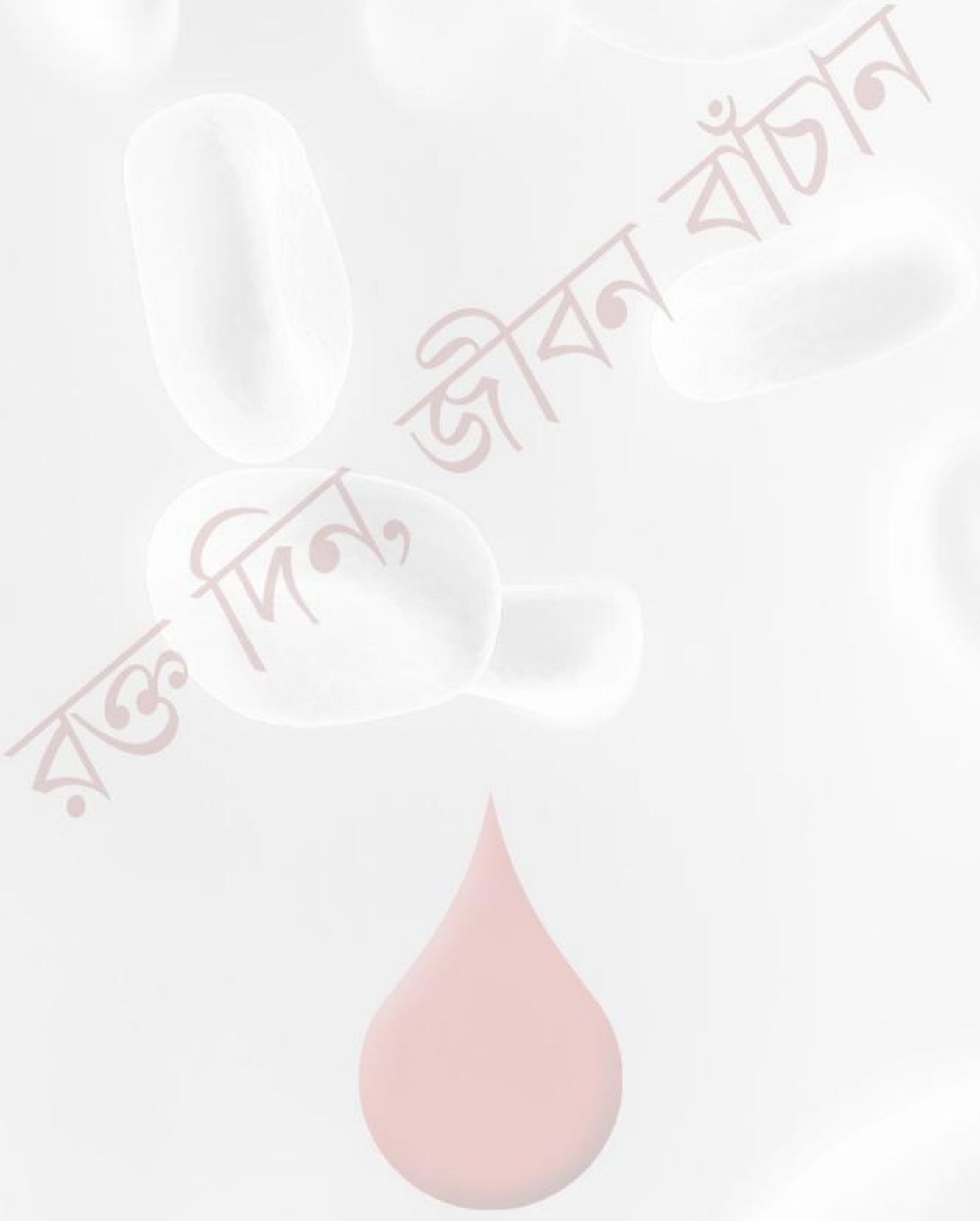

রাত ২টার মত বাজে, মাত্র ঘুমিয়েছি। তখনই আফনানের ফোন, দোস্ত ইমারজেন্সি ব্লাড লাগবে।
ঘুমের মধ্যে কোন মতে উত্তর দিলাম, দোস্ত অনেক রাত, শীতের মধ্যে বের হতে পারবো না।
- দোস্ত খুব জরুরী, বাইক এক্সডেন্ট করেছে।
- ভাই B+ এর অভাব নাই, আমায় প্লিজ একটু ঘুমাইতে দে। সকালে প্রাইভেট আছে। তুই অন্য কেউকে নক কর।
- ফয়সাল প্লিজ ইটস আর্জেন্ট।
- ভাই যাইতে পারমু না।
বলে কেটে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেক ফোন দিচ্ছে বলে ফোন সাইলেন্ট করে রাখলাম। ৩ টার দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো তখনো দেখি মোবাইল বাজছে। তবে এবার আফনানের ফোন না। শিপা ফোন করছে। কোন মতে উঠে বসে, ফোন রিসিভ করে বললাম, হ্যা জানু বলো।
- তুমি কই?
- এইতো বাসায় ঘুমাচ্ছিলাম, কেন?
- কেন মানে! ! ! তোমায় আফনান ভাই ফোন দেয় নাই?
- ওই শালায় তোমাকেও ফোন দিছে!!
- আমায়ও ফোন দিছে মানে কি? ইমার্জেন্সি রক্ত লাগবে শোনার পরও তুমি যাওনি কেন?
- রাত অনেক আর শীতটাও প্রচুর পড়েছে।
- তোমার কি মনে হয় না, লোকটা যদি মারা যায় তার জন্য তুমি দায়ী থাকবা?
- আমি কি করছি? আমি কি বাইক চালাচ্ছিলাম যে একসিডেন্টটা আমি করিয়েছি?
- তুমি প্লিজ একটু সদর হাসপাতালে যাও, লোকটার অবস্থা খুব খারাপ। রক্ত না হলে বাঁচবে না।
- এই শীতের মধ্যে?
- প্লিজ যাও কোন কথা বলো না। তোমার সাথে এই বিষয় নিয়া আমি পরে কথা বলব।

আফনানকে কল দিলাম, কিরে ব্লাড ম্যানেজ হইছে?
- ফয়সাল এক ব্যাগ ম্যানেজ করেছি। আরও এক ব্যাগ লাগবে। প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে।
- আচ্ছা। আমি আসছি।

যাওয়ার পথে শিপা আমায় আরও কয়েকবার ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোন পর্যন্ত গেছি। হাসপাতালে গিয়ে ব্লাড দেয়ার পর জানতে পারলাম, ব্লাড ম্যানেজ করতে দেরী হলে রোগীকে বাঁচানো যেতো না। শোনার পর এতটা খারাপ লাগছিল বলে বুঝাতে পারব না। আমি কি করছিলাম এটা! এতটা অমানুষ হয়ে গেছিলাম! জানোয়ারের মধ্যেও এর চেয়ে বেশী মায়া-মমতা থাকে জীবনের প্রতি। পরে শিপাকে ফোন দিলাম। ওকে সব

বলার পর ও বলল, যে মানুষটা এমন এটা ঘৃণিত কাজ করতে পারে, তার সাথে আমি আমার সারাজীবন কাটাতে পারব না। মৃত্যুর সাথে লড়াই করা একটা মানুষকে বাঁচানোর সুযোগ পেয়েও যে মানুষটি আলসেমি করে কম্বলের নিচে ঘুমিয়ে কাটায়, সরি তার সাথে আমার কথা বলতেও লজ্জা লাগছে।
এর পর ও ফোন কেটে, সুইচ অফ করে রাখে। সকাল পর্যন্ত হাসপাতালেই বসা ছিলাম। পরে ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাস করে জানতে পারি, এখন আর ভয়ের কিছু নাই। কিছু সময় পর জ্ঞান ফিরে আসবে। তখন বাসায় ফিরে আসি।

আসার সময় নিজের প্রতি যে নিজের কি পরিমান গর্ব হচ্ছিল কোনো ভাষায় তা বুঝানো সম্ভব না। মনে হচ্ছিল আমি কাউকে জীবন দিলাম। সেই মুহূর্টা ছিল অন্য ধরনের, যারা রক্ত দিয়ে থাকে তারাই কেবল বুঝতে পারবে। আমি এর আগে ৮বার রক্ত দিয়েছি, তবে এই শেষবারের বিষয়টা ছিল অন্য রকম এক অভিজ্ঞতার।

পরের দিন হাসপাতালে যাই, তখন দেখি লোকটার সব আত্মীয়স্বজন সেখানে উপস্থিত। যখন জানতে পারে আমি রক্ত দিয়েছিলাম, এমন এত ভালোবাসা সেদিন পেয়েছিলাম, যা কোনোদিন ভাবতেও পারি নি। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম শুধু।

তবে সব চেয়ে মজার বিষয়টা ছিল, শিপা এই বিষয়টা নিয়ে আমার সাথে পুরা ১ মাস কোন যোগাযোগ করেনি। এমন গার্লফ্রেন্ড থাকার কারনে আমি গর্ব করি।

রক্তদাতাঃ Mehedi H Sajjad অভিজ্ঞতাঃ ৬ (সূচিপত্র)

দিনটা ছিল আমার জীবনের একটা দুর্দশাময় সময় যখন আমি কোথাও ভার্সিটিতে চ্যান্স পাচ্ছিলাম না। হ্যা এমনই একটা সময় যখন মনে হচ্ছিল আমি কিছুর জন্য নয়, আমার দ্বারা কিছু হবে না।

দিনটা ৭ মে, ২০১৪। সকাল ১০ টা নাগাদ ফেসবুকিং করছিলাম আনমনে, হঠাৎ একটা পোষ্ট দেখলাম যে একজন প্রসুতি বোনের জন্য ৪ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন। হঠাৎই মনে হল আমি কিছু করতে পারব। কিন্তু জীবনে প্রথম রক্তদান! পাশে কেউ নেই, কি করবো, কিভাবে করবো - কিছু জানি না।

ফোন করলাম পোষ্টে দেয়া নাম্বারে, ফোনটা তুলল রোগীর ছোট ভাই। ছেলেটা কেঁদেই ফেলল আর বলল বাচ্চাটা মারা গেছে, তার বোনের অবস্থাও ভাল না। আমি তখনই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি রক্ত দিবই, এবং আজই, আমার যা হয় হবে।

একাই চলে গেলাম রাজশাহী মেডিকেল ব্লাড ব্যাংকে। অচেনা অজানাভাবে একা রক্ত দানে যাওয়াটা সেদিন অনেক রিস্কি ছিল কিন্তু আমি যে ঝোকের মধ্যে ছিলাম যা আমাকে এটা করতে ব্যাধ্য করেছিল।

রক্ত দিতে গেলাম ১২ টা নাগাদ, রাজশাহী মেডিকেল ব্লাড ব্যাংক অনেক ব্যস্ত একটা ব্লাড ব্যাংক তবুও তাড়াতাড়িই রক্ত দিতে পারলাম ইমার্জেন্সি থাকার কারনে। রাজশাহী মেডিকেল এর মেডিকেল এসিস্টেন্টরা এতটাই আন্তরিক ছিল যে আমার প্রথম রক্তদানের ভয়টা কাটিয়ে দিয়েছিল।

রক্তদানের পর রোগীর বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেলল আর একটা কথা বলল যেটা সারা জীবণ মনে থাকবে, "আজ থেকে বাবা তুমি আমার আর একটা ছেলে, আজ থেকে আমার ২টা না ৩টা ছেলে। তুমি এই বাবার বাড়িতে আসবে"।

যাই হোক অনেক বার কথা হয়েছে তাদের সাথে,পরে একটা মেয়ে হয়েছে সেই বোনটার।

হুম এটাই ছিল আমার সবচেয়ে স্মরণীয় এবং প্রথম রক্তদানের গল্প। তারপর কেটে গেছে আড়াই বছর। আমি দশবার রক্তদান করেছি, আরো অনেক অনুভুতি, অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু সেই বাবার কথাটা এখনো কানে বাজে "আজ থেকে বাবা তুমি আমার আর একটা ছেলে,আজ থেকে আমার ২ টা নয় তিন টা ছেলে"

প্রথমত দেখতে নিরীহ প্রাণি মনে হলেও এর ভেতরে যে বাঁদরামির বিশেষ সফটওয়্যার ইন্সটল করে দেয়া তা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি! সেই যে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর থেকে শুরু- খামচে দেয়া, কিল, একটু পর পর মুখ ভেংচি আর কি সব যেন বলার চেষ্টা করছে - আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা। এতক্ষণে কিছুটা বিরক্তিও এসে যাচ্ছে, এইভেবে যে পাশের বেঞ্চিতে বসা তার মা আর সাথে দাদী কিংবা নানি হবে হয়তো, কেউ তাকে থামানোর চেষ্টাও করছেনা!

রোযার দিন। অফিস শেষে বাসায় ফেরার পথে কথা দিয়েছিলাম হাসপাতালে যাবো! কিন্তু হায়, রাস্তায় গাড়ির যেই জ্যাম, নিজেকে বড় অসহায় মনে হতে লাগলো এই ভেবে যে, "কাউকে রক্ত না দিতে পারার চেয়ে কথা দিয়ে না যাওয়া সত্যিকার অর্থে অন্যায়! কেননা আমি না রাজি হলে হয়তো এই জরুরি মুহূর্তে অন্য ব্যবস্থা নিতে পারতো রোগীর লোকজন!"

দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে পল্টন থেকে হাঁটতে শুরু করলাম! বিকেলের ক্লান্তিতে শহরটা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, গাড়িগুলো ঠাঁই দাঁড়িয়ে! রাস্তার পাশের ইফতারের দোকান জমে উঠেছে ততক্ষণে। ঘামে ভেজা শার্ট ব্যাকপ্যাকের চাপে লেপ্টে গেছে গায়ের সাথে। কিন্তু পায়ের নিস্তার নেই, কথা যে দিয়েছি, আমার জন্য হয়তো রোগীকে.....! ভাবতে পারছিনা কিছুই। হাঁটছি কেবল! নয়াপল্টন, কাঁকরাইল মোড়, পুলিশ হেডকোয়ার্টার !

হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল। যিনি যোগাযোগ করেছিলেন তিনি ঢাকা মেডিকেলের স্টুডেন্ট। তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় যাকে রক্ত দিতে এলাম। বললেন, ভাই কিছু মনে করবেন না, পিচ্চিটা আপনার সাথে এমন দুষ্টুমি করছে। তাকে কিছু বললে আর থামানো যাবেনা। সে মানসিক প্রতিবন্ধী। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। তার মুখে আজ পর্যন্ত মা ডাক শুনতে পারেনি তার মা, আর বাবা তো এক হৃদয় দুঃখ পোষে এই অবস্থায়। পিচ্চিটা কথা বলতে পারেনা!
সব জেনে এই কিঞ্চিত বিরক্তির জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হলো।

রোগী বঙ্গভবনে একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। দুটো কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে! ডায়ালাইসিস চলছে বেঁচে থাকার তুমুল চেষ্টায়। লিফট থেকে ধরাধরি করে এনে ডায়ালাইসিস রুমে আনা হলো, লোকটার মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। ঢামেকের ভাইটি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ইনি আপনাকে এই রোযার মধ্যেও রক্ত দিতে রাজি হয়ে এসেছেন!" মুমূর্ষু লোকটির চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো, কথা হলোনা!

ইফতারের সময় ঘনিয়ে আসছে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে। রক্ত দেয়া শেষে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার নিয়ম থাকলেও তা না মেনেই উঠে এলাম দুইমিনিট পর। পিচ্চিটা তখনো দুষ্টুমি করছে অন্য একজনের সাথে। রোগীর লোকেরা একটা জুস আর পানি সাথে কিছু ফলসহ একটা প্যাকেট আমার হাতে জোর করে ধরিয়ে দিলেন। যেন আমি রাস্তায় ইফতার সেরে নিই। আমি অনেক কষ্টে তাদের আবদার উপেক্ষা করে

পিচ্চিটার হাতে দিয়ে এলাম, "এটা আমার পক্ষ থেকে ওর জন্য! আমি আপনাদের কথা রেখেছি! আপনাদেরও আমার কথা রাখতে হবে।"

তাদের অশ্রুসিক্ত চোখে যে চাহনি দেখলাম তাকেই বোধহয় হৃদয় থেকে প্রার্থনা বা কৃতজ্ঞতা বলে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে হাসপাতাল গেট পেরিয়ে রাস্তায় পা রাখতেই কেমন একটা জড়তা অনুভব করলাম! কে যেন পেছন থেকে জাপটে ধরেছে আমাকে! ফিরে তাকাতেই দেখি সেই দুষ্টু পিচ্চিটা যার বাবাকে রক্ত দিয়ে এলাম। চোখ বেয়ে পানি! কি যেন বলতে চাইছে! কি বলতে চাইছে সে, নির্বাক আর্তনাদে?

রক্তদাতাঃ Tamzid Zubaer অভিজ্ঞতাঃ ৮ (সূচিপত্র)

২০১১ সালের কথা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ফুপা গ্রীন রোড 'গ্রীন ভিউ' ক্লিনিকে ভর্তি। হাসপাতালে আমি আর ফুপুই ছিলাম সবসময় ফুপার পাশে। ফুপার দুই দিন পর পরই এক ব্যাগ প্লাটিলেট লাগতো, প্লাটিলেট কি জিনিশ তখন বুঝতাম না । সিঙ্গেল প্লাটিলেট নেয়ার প্রসেসিং ছিল কিনা তাও জানতাম না।

প্রতিদিন ৩ জন করে ডোনার ম্যানেজ করা লাগতো। ব্লাডের জন্য ঢাকার এমাথা-ওমাথা দৌড়াতাম। বিভিন্ন সংগঠন গুলির কাছে হাত পাততাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা প্রর্যন্ত কোয়ান্টামে গিয়ে বসে থাকতাম। এইভাবে প্রায় ১০-১২ দিন ব্লাড ম্যানেজ করার পর হঠাৎ করেই একদিন ডোনারের অভাবে প্লাটিলেট দিতে পারলাম না। ফুপার অবস্থাও খারাপের দিকে। তারপর দিন ভোরেই বেরিয়ে গেলাম ডোনার খুঁজতে বিকেল প্রর্যন্ত খুঁজে ঢাকা কলেজ থেকে এক ভাইয়াকে ম্যানেজ করলাম। এখনো দুইটা ডোনার লাগবে এদিকে ফুপার অবস্থা খুব খারাপ। প্লাটিলেটের কাউন্ট ২০০০০ এর নিচে নেমে আসছে। ফুপুর কান্নাকাটি। ৫ মিনিট পরপর ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করে, বাবা ব্লাড পাইছো?

আমি শুধু মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বলতাম এইতো পেয়ে যাবো এখনি।
ততক্ষণে সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে ছুটে গেলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির বাঁধনে।
ওদের কাছে ইমার্জেন্সি ব্লাড চাওয়ার পর ওদের রেজিস্ট্রি খাতায় আমার নাম, ব্লাড গ্রুপ, ফোন নাম্বার নোট করে রাখলো আর জিজ্ঞেস করলো ওরা যদি কখনো ব্লাডের জন্য নক করে তাহলে দিবো কিনা, আমি বললাম অবশ্যই দিবো। আমি এর আগে আরো দুইবার ব্লাড দিয়েছি - কথাটা শেষ করতে পারলাম না, পিছন থেকে এক লোক খুব কাকুতিমিনতি করে কান্নাভেজা কন্ঠে রিসিপশনে বসা আপুকে বলতেছে যে তার মা এক্সিডেন্ট করেছেন। ইমার্জেন্সি ব্লাড প্রয়োজন ঢাকা মেডকেলে।

আপু ওনাকে ব্লাড গ্রুপ জিজ্ঞেস করলেন। ওনি যে ব্লাড গ্রুপ বললেন তা আমার সাথে মিলে গেল।
আমি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আপু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি দিবেন ব্লাড?
সারাদিনে তেমন কিছুই না খেয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করায় শরীর খুব দুর্বল হয়ে ছিলো তার উপর আমার নিজেরই দুই ব্যাগ ব্লাড ম্যানেজ করতে হবে মাথায় সেই চিন্তা, এক মূহুর্ত ভেবে রাজি হয়ে গেলাম।
ক্রসমেচিং এর পর ব্লাড টানা হলো । ১০/১৫ মিনিট রেষ্ট নেয়ার পর শোয়া থেকে উঠতে গেলাম কিন্তু নড়তে পারলাম না। মনে হচ্ছিলো আমার শরীরে হাত/পা নাড়ানো মতো শক্তিও নেই।

যে ভাইয়া ব্লাড টেনেছে তাকে সমস্যার কথা খুলে বলতেই সে বললো, আরো ১ ঘন্টা রেষ্ট নিন ঠিক হয়ে যাবেন। ভাইয়া আমকে দুই গ্লাস গ্লুকোজ খাওয়ালেন ওই শোয়া অবস্থাতেই।

এইদিকে ফুফু বার বার ফোন দিচ্ছিলেন ব্লাড ম্যানেজ করতে পেরেছি কিনা তা জানার জন্য কিন্তু আমি যে তখন নিজেই ব্লাড দিয়ে শুয়ে আছি এই কথা ফুফুকে বলার সাহস হয়নি।

সেই রাতে আর ব্লাড ম্যানেজ করতে পারিনি। তারপর দিন সকালে বাঁধন দুই ব্যাগ ব্লাড দিয়েছিলো। তার কিছুদিন পরই ঈদের দিন ফুফা মারা যান। হাসপাতালে থাকা ওই ১৫/১৬ দিনে আমি বুঝেছি রক্ত কি জিনিশ, প্রয়োজনের সময় রক্তের জন্য মানুষ কতোটা দিশেহারা হয়। তারপর থেকেই নিয়মিত রক্তদান করে আসছি ও কারো রক্তের প্রয়োজন লাগলে ব্যাবস্থা করে দেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি।

আল্লাহ্‌র রহমতে এখন প্রর্যন্ত আমি ১১ বার ব্লাড ও ৬ বার প্লাটিলেট দিয়েছি দান করে যাবো সামর্থ্য থাকা প্রর্যন্ত যতদিন বেঁচে থাকবো।

সময়টা ছিল ২০১৬ সালের মে মাসের ৩ তারিখ। সকাল ১০টায় গ্রামের বাড়ি থেকে এক বন্ধু ফোন দিয়ে বলল, "খুব কাছের বন্ধুটা এক্সিডেন্ট করেছে"। তাকে ফেনী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আমি যেহেতু ফেনী শহরেই থাকি, তাকে যেন হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু ক্লাসে ছিলাম বলে তখন যেতে পারি নাই।

বিকাল ৩টা। যে বন্ধু এক্সিডেন্ট করেছে তাকেই ফোন দিলাম। ওর বোন ফোন রিসিভ করে বলল, "ভাইয়া, এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। অবস্থা খুব খারাপ। বাঁচবে কিনা জানি না, ফেনী সদর থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ট্রান্সফার করা হয়েছে, ভাইয়াকে নিয়ে আমরা এখন চট্টগ্রাম মেডিকেল আসছি।"
এর কিছুক্ষন পর হাসপাতাল বেড থেকে ওই বন্ধুর ফোন। কন্ঠটা এত ভারী যে বুঝতে পারতেছি না,"দোস্ত আমি মনেহয় আর বাঁচবোনা, আমাকে ক্ষমা করে দিস, আর শোন, আমার রক্ত লাগবে, তোর রক্তের গ্রুপ তো বি পজেটিভ, আমায় রক্ত দিবি???

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে নিশ্চুপ দাড়িয়ে রইলাম। খানিক বাদে বললাম, হ্যাঁ দিবো। কখন লাগবে? আমাকে কখন যেতে হবে?
সত্যি বলতে কি তখন রক্তদান নিয়ে আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না। শুধুমাত্র নিজের রক্তের গ্রুপ জানতাম। আম্মুকে ফোন দিলাম। বিষয়টা শেয়ার করলাম। সচরাচর বেশীরভাগ আম্মুই রক্তদান করার ক্ষেত্রে বাঁধা দেয়। কিন্তু সেইদিন আমার আম্মুই বলছিল, "যা বাবা, সাবধানে যাস, তোর কাছে টাকা আছে? "
- হুম আছে।
- তাহলে যা, আল্লাহ ভরসা।

খুব সম্ভবত শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত আম্মু যদি আমার কোনো কাজে অনায়াসে সাড়া দিয়ে থাকে, তবে এটাই ছিলো প্রথম। সন্ধ্যায় রওনা দিলাম চট্টগ্রাম মেডিকেলের উদ্দেশ্যে। চিকিৎসক না থাকায় খুব রাত্রিতে রক্তদান করা আর সম্ভব হয়নাই। মনের ভিতর একটাই প্রশ্ন ছিল, আমার রক্ত নিচ্ছে না কেন? চোখে মুখে ছিল যথেষ্ট উত্তেজনার ছাপ। কখন যে রক্তদান করবো।

ওই দিকে রুগীর অবস্থা আরও খারাপ। পরদিন বেলা সাড়ে এগারটা। সেই মহৎ কাজটি সম্পন্ন হল। মহান আল্লাহর কাছে লাখো লাখো শুকরিয়া জানাই রক্তদান করার মত একটা মহৎ কাজ আমার কপালে রাখার জন্য। সত্যি বলছি জীবনে আর কোনোদিন কোনো কাজে এমন তৃপ্তি পাইনি, যতটা রক্তদান করার পর মুহূর্তে পেয়েছি। জীবনে ছোট-খাটো অনেক মঙ্গল কাজই করেছি। কিন্তু রক্তদান করার পরের অনুভূতির সাথে অন্য কোনো কাজের তুলনা কখনোই হতে পারে না। রক্তদান করে যখন বাড়ি ফিরলাম, ততক্ষণে গ্রামের

সবাই মোটামুটি আমার রক্তদানের বিষয়টা জেনে গেছে। এর আগে এলাকার কেউ রক্তদান করেনি বিধায়, অনেকে আমাকে দেখতেও এসেছিল। প্রতিবেশী এবং এলাকার মানুষদের কাছ থেকে যে আর্শিবাদ ও ভালোবাসা পেয়েছি তার জন্য আমি কখনো প্রস্তুত ছিলাম না। মানুষের এত আন্তরিকতা আর ভালোবাসা জীবনে আর কোনোদিন পাইনি। পরক্ষণে ভাবতে লাগলাম, এক ব্যাগ রক্তদান করলাম, আর তাতেই মানুষের এত ভালোবাসা এত আন্তরিকতা। কিন্তু প্রতিদিনই তো অনেক মানুষ রক্ত না পেয়ে মারা যাচ্ছে, তাদের জন্য কি আমার কিছুই করার নাই? আমরা তরুণেরা যদি এগিয়ে আসি, ইনশাআল্লাহ মানবতার জয় হবেই। প্রতিনিয়ত মানুষের রক্ত ম্যানেজ করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। দিন হোক আর রাত হোক যখনই পারছি অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করতেছি। ইনশাআল্লাহ যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন অসহায় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করবো, কথা দিলাম। আর হ্যাঁ প্রথম রক্তদান করা সেই বন্ধুটা আজও বেঁচে আছে, যদিও এখনো সে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না।

এটাই ছিলো আমার প্রথম রক্তদান এবং সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। জয় হোক মানবতার।

রক্তদাতাঃ RH Arnob অভিজ্ঞতাঃ ১০ (সূচিপত্র)

আমার বাসা নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার থানার ছোট একটি গ্রামে। পড়শোনার জন্য আমি ঢাকার মোহাম্মদপুরে থাকি। ঢাকা থেকে আমার গ্রামের বাড়ির দুরত্ব ৪২ কিলোমিটার। তবে এই ৪২ কিলোমিটার যেতে হলে আমাকে ৩টা গাড়ি পরিবর্তন করতে হয়।আমার গ্রাম আর এই কিলোমিটারের হিসেবের সাথে জড়িয়ে আছে আমার জীবনের স্বরনীয় একটি মূহুর্ত।

সময়টা ছিল ২০১৬ সালের আগষ্ট মাসের ১৪ তারিখ, রাত তখন ১০টা। ১ মাস পর ছুটিতে গ্রামে যাই ঐ দিন সন্ধ্যায়। রাতে খাওয়া শেষ করে আব্বু-আম্মুর সাথে টিভিতে বাংলাভিশন চ্যানেলে খবর দেখছিলাম রাত ১০টার, ঠিক তখনই নিচের হেডলাইনে দেখলাম, ‘একটি মুমূর্ষু রোগীর জন্য ইমার্জেন্সী রক্তের প্রয়োজন, রক্তের গ্রুপ এবি নেগেটিভ’। আমার রক্তের গ্রুপ যেহেতু এবি নেগেটিভ আর আমার তখন ১০ম বারের মত রক্ত দেয়ার সময় প্রায় হয়ে গিয়েছিল, তাই সাথে সাথে যোগাযোগের নাম্বারে ফোন দিলাম। ফোন রিসিভ করলো এক আন্টি যিনি রোগীর স্ত্রী ছিলেন। ফোন দিয়ে রোগীর সমস্যা আর সব বিস্তারিত জানলাম পরে উনি বললেন যে তখনি রক্ত লাগবে আর আমার ঢাকা আসা-যাওয়ার ব্যাবস্থা উনিই করবেন। আমি তখন উনাকে বললাম যে, আন্টি আমি আসবো, আমার জন্য কিছু করতে হবে না আর কোন গাড়ির ব্যবস্থা ও করতে হবে না।

যেহেতু সেদিন সন্ধ্যায় মাত্র বাসায় গিয়েছি তাই আম্মু-আব্বুকে রাজি করানো কঠিন ছিল, তবুও অনেক মিথ্যা কথা বলে অনেক বুঝিয়ে ঢাকায় আসার জন্য তাদের অনুমতি পেলাম। রওনা দিতে দিতে প্রায় রাত ১২টা বেজে গেছে। যেহেতু গ্রাম সেহেতু এত রাতে গাড়ি পাওয়া দুঃসাধ্য। বাসস্ট্যান্ড এসে ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকার পরও কোন গাড়ি পাচ্ছিলাম না, রাত বাজে তখন ১.২০ মিনিট। ব্রাহ্মনবাড়িয়া থেকে আসা একটি সবজি বোঝাই ট্রাক ঢাকার দিকে যাচ্ছিল, আমি গাড়ি না পেয়ে সেই ট্রাক থামালাম। ট্রাক ড্রাইভারকে সব কিছু বুঝিয়ে বলার পর উনি আমাকে নিতে রাজি হলেন। উনি কারওয়ান বাজারে আসবেন সবজি নিয়ে, আমি যেহেতু স্কয়ার হাসপাতাল যাবো তাই উনি আমাকে বসুন্ধরা সিটির সামনে নামিয়ে দিবেন বললেন। আমি ট্রাকের পিছনে সবজির বস্তার উপর উঠে বসি। ট্রাক চলতে চলতে ৪২ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ২.৪০ মিনিটে কারওয়ান বাজার আসে। আমি নেমে পড়ি আর ট্রাক ড্রাইভারকে ভাড়া দিতে গেলে আমার কাছ থেকে ভাড়া না নিয়ে উনি বললেন, বাবা জীবনে অনেক বড় হও, তুমি একটা ভালো কাজে যাচ্ছো আর আমি সেই ভালো কাজের অংশীদার হলাম।
তারপর উনি চলে গেলেন আর আমি হসপিটাল চলে আসি।

হসপিটাল আসতে আসতে প্রায় ৩টা বেজে যায়। হসপিটাল এসে রুগীর রিলেটিভদের সাথে দেখা করে রক্ত দেয়ার জন্য ক্রসমেচ করতে দেই। স্কয়ার হসপিটালে ক্রসমেচ করার জন্য ৪ ঘন্টা সময় নেয় তারা। আমি সেই ৪ ঘন্টা অপেক্ষা করে ১৫ই আগষ্ট সকাল ৮টার দিকে ১০ম বারের মত রক্তদান করি।
তারপর সেই রুগীর জন্য আরো ৪ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন হয়, আমি তার মধ্যে এক ব্যাগ ম্যানেজ করে দেই। রক্তদানের পুর্বে অনেক এক্সাইটেড ছিলাম আর রক্ত দেওয়ার পর নিজের কাছে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছিল

১০ম বারের মত রক্তদান করে। তাই ১০ম বারের রক্তদানের মুহুর্ত আমার জীবনে স্বরণীয় মুহুর্ত হিসেবে স্থান পেয়েছে আমার জীবনে।

তারপর থেকে আমি কিছুদিন পর পর সেই রুগীর খোজ নেই। এখন উনি আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছেন। তারপর আমি আরো একবার রক্ত দিয়েছি।

রক্তদাতাঃ Sukh Sahara অভিজ্ঞতাঃ ১১ (সূচিপত্র)

রক্ত দেবার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকে, কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠেনি তখনো। কারণটা অবশ্য আমার মা। আমার মায়ের ধারণা, মেয়ে মানুষের রক্ত দেয়া উচিত নয়। তাকে হাজার বুঝিয়েও লাভ নেই। সমস্ত যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে তার যুক্তি। আমাদের বাড়িতে সবারই রক্তের গ্রুপ যেহেতু "ও পজেটিভ", তাই এই গ্রুপের কারো রক্তের প্রয়োজন হলে দেখা যায়, আমার ভাই দিয়ে আসে। আমার আর দেয়া হয় না।

সেদিন ছিল ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সাল। সকালে ফেইসবুকে ঢুকেই দেখলাম আমার এক বন্ধুর বাবা বাইক এক্সিডেন্ট করেছে। তার পায়ের হাড্ডি খুব খারপভাবে ভেঙ্গে গেছে। ছয় ব্যাগ "ও পজেটিভ" রক্ত লাগবে। রংপুর হাসপাতালে আছে, ইমারজেন্সিতে। খুব খারাপ লাগল সংবাদটা পড়ে। সকাল সাতটায় ইংরেজী প্রাইভেট ছিল। প্রাইভেট শেষে আর বাসায় ফিরলাম না। কারণ বাড়িতে মাকে বললে, মা কিছুতেই একা একা হাসপাতালে যেতে দেবে না। আমার সেই বন্ধুটিকে ফোন দিলাম যার বাবা একসিডেন্ট করেছিল(ওর নাম নোমান)। ফোন রিসিভ করেই ওর কান্নায় জর্জরিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম। খুব খারাপ লাগছিল! ও জানালো, তিন ব্যাগ রক্ত যোগাড় হয়েছে। আরো তিন ব্যাগ রক্ত লাগবে।

খুব ছোটবেলায় কোন এক আত্বীয়কে দেখতে রংপুর হাসপাতালে গিয়েছিলাম একবার। তারপর আর কখনো যাওয়া হয়ে উঠেনি। একা একা যেতে একটু ভয় ভয় করছিল। কিন্তু আমার কোন বন্ধু সেই মূহূর্তে আমার সঙ্গ দিতে পারছিল না। সবাই যে যার কাজে ব্যাস্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিশ্চয়ই আমার সেই মুহূর্তটির কথা চিন্তা করেই লিখেছিলেন-"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে....".

বাজারে একটা ডিশপেনসারিতে প্রেসারটা চেক করে আল্লাহর নাম নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। হাসপাতালের গেটে নোমান আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ল্যাবে গিয়ে দেখলাম অনেকেই রক্ত দিতে এসেছে, আবার অনেকে দিচ্ছে। ওদের রক্ত দেয়া দেখে, একটু একটু যে ভয়টা ছিল সেটা কেটে গেল।

প্রথমে আমার বাম হাতে সূচ ফোড়ানো হল। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ছিলাম। ছোটবেলা থেকেই সূচ, সিরিজ জিনিসগুলোকে আমি ভীষণ ভয় পেতাম। এখনো অবশ্য পাই। কিন্তু কেউ একজন আমার রক্তের জন্য বেচেঁ যাবে - এটা ভাবলেই আর কোন রকম ভয় কাজ করে না। অদ্ভুত রকম একটা সাহস ভর করে মনে। অর্ধেক ব্যাগ রক্ত পূর্ণ হওয়ার পর, হঠাৎ রক্ত আসা বন্ধ হয়ে গেল। সকালে না খেয়েই প্রাইভেটে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম এসে খাব। হয়ত খালিপেটে থাকার কারনেই রক্ত বের হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে ডান হাতে সিরিজ ফুটানো হল। কিন্তু খুব বেশী রক্ত বেরুলো না। কোয়াটার পরিমান ব্যাগ রক্ত নিয়েছিল। মনটা একটু খারাপ

হয়ে গিয়েছিল!! প্রথমবার রক্ত দিতে এলাম, অথচ একটা ব্যাগ ভর্তি করে রক্ত দিতে পারলাম না।

তার দুইদিন বাদে, নোমান আমাকে ফোন দিল। ওর বাবার জন্য রক্ত যোগাড় হয়ে গিয়েছিল। আমার রক্তটা তখনো অবশ্য ওর বাবার শরীরে দেয়া হয়নি। পরদিন দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেইদিন হাসপাতাল খুব সিরিয়াস টাইপ একজন রোগী এসেছিল যার অপারেশন করাটা খুব জরুরী ছিল। কিন্তু সেই রোগীটি ছিল খুব দরিদ্র আর তার সাথে তেমন কোন লিগ্যাল গার্জিয়ানও ছিল না। তাই কোন ডাক্তার ব্যাপারটা আমলে আনছিল না। সরকারি হাসপাতালগুলোতে যেমন হয় আর কি! রোগীর এই অসহায় অবস্থা দেখে নোমান নিজ দ্বায়িত্বে তদারকি করে রোগীটির অপারেশনের ব্যবস্থা করে। সেই রোগীর রক্তের গ্রুপও ছিল "ও পজেটিভ"। সেই মুহূর্তে নতুন করে রক্ত খোজাঁর সময় ছিল না। তাই নোমান তার বাবার জন্য রাখা আমার রক্তটাই সেই রোগীটিকে দিয়েছিল।

নোমানের কাছে ফোনে এসব কাহিনী শোনার পর, আমি বললাম, "সমস্যা কি? কোন না কোন একজনের তো কাজে লেগেছে, আমার দেয়া রক্তটা, এটাই বড় কথা। হয়ত আমি তাকে চিনিনা, জানিনা, দেখিনি আর কখনো দেখার সম্ভাবনাও নেই; এইটুকুই তো পার্থক্য....!!!"

তারো দুইদিন বাদে আমার আর একজন বন্ধু ফোন করে জানালো নোমানের বাবা মারা গেছে। না, না রক্তের জন্য নয়। নোমানের বাবা মারা গেছে ব্রেইন স্টোক করে। এটা আমার জীবনের অবশ্যই স্বরণীয় ঘটনা। প্রথম যাকে রক্ত দিলাম, সে রক্ত তার শরীরে প্রবাহিত না হয়ে অন্য কারো শরীরে প্রবাহিত হলো। যাকে চিনিনা, জানিনা, দেখিনি আর দেখবো না। এমন একজনের শরীরে আমার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছ, ভাবতেই অন্যরকম লাগে! আর যার জন্য রক্ত দিতে গিয়েছিলাম সে আর বাচঁল না। সৃষ্টিকর্তার লীলা বোঝার ক্ষমতা, আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের সাধ্যে নেই। কক্ষণো নেই।

রক্তদাতাঃ Kazi Hakim অভিজ্ঞতাঃ ১২ (সূচিপত্র)

১ম বা ২য় বার নয়, বলছিলাম ৫ম বার রক্তদানের কথা, এক অবিস্মরণীয় স্মৃতিরেখা।
প্রায় দু'বছর আগের কথা। আশেপাশের সবার কাছে রক্তদাতা হিসেবে বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেছি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবার রক্তের প্রয়োজনে প্রথম কলটি আমার কাছেই আসে। দিনটি ছিল ২২/০৫/১৫ইং শুক্রবার। পড়ালেখায় খুব ব্যস্ত ছিলাম, কাল থেকেই শুরু হচ্ছে হাদীস বিভাগের ফাইনাল পরিক্ষা। তাও আবার প্রথম দিন 'বুখারী শরিফের' পরিক্ষা। পরিক্ষায় ঈর্ষনীয় ফলাফলের উপর নির্ভর করছে আমার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার। তাই প্রস্তুতি চলছিল রাত-দিন একাকার করে। নিরবিচ্ছিন্ন পড়ালেখা! অন্যদিকে ফিরে তাকাবার ফুরসত নেই।

আচমকা বেজে উঠলো মোবাইল। কল রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো বন্ধু তারিকের দরদী কন্ঠ, দোস্ত! তোর তো রক্তদানের তিন মাস পেরিয়ে গেছে। একটু সদর হাসপাতালে আসবি??? এক প্রসূতিকে রক্ত দিতে হবে।

ভেতর টা নড়ে উঠলো। ক্ষণিকের জন্য সব কিছু ভুলে গেলাম। হাসপাতালে ছুটলাম, 'নোয়াখালি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল'। হাসপাতাল গেটেই দেখা হয়ে গেল রোগীর স্বামীর সঙ্গে। বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন পড়েনি, কারণ বন্ধু তারিক পূর্বেই উনাকে ইনফর্ম করে রেখেছিল। তাড়াতাড়ি রক্তদান সেরেই মাদ্রাসায় ফিরবো।

ঠিক তখনই ঘটল অবাক কান্ড! রোগী আমায় ক্ষণিকের জন্য হলেও দেখতে চায়! কি আর করা! চললাম, তাঁর সে আশাটুকু পূরণ করতে। কেবিনে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল রোগিণী শুয়ে আছে বেডে। আমাকে দেখা মাত্রই অঝোর ধারায় কান্না শুরু করল। পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না! কথা বলতে চাইলাম, কিন্তু কান্নার কারণে তার মুখে কোন কথাই আসছিল না। অগত্যা মিছে সান্ত্বনা দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। (এখনো সে পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ হয়।)

রোগীর স্বামীর সঙ্গে সামান্য আলাপচারিতা সেরেই ছুটলাম মাদ্রাসার দিকে। মনে মনে ভয় হচ্ছিল পড়ালেখার ব্যাঘাত ঘটায় 'বুখারী শরিফ' পরিক্ষায় খারাপ করি কিনা? নাহ! ভালো ভাবেই পরিক্ষা দিলাম। পরিক্ষা শেষে ছুটিতে বাড়ি আসলাম। দীর্ঘ ৩৫ দিন পর, ফলাফল ঘোষণা হলো। ফলাফলপত্রে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল এক দারুণ চমক! ফলাফলপত্রে তাকাতেই বিস্ময়ে আমার চক্ষু ছানাবড়া, 'হা' হয়ে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। রক্তদানের পর যে বিষয়টি নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছিল 'বুখারী শরিফ', সে বিষয়ে আমার সর্বোচ্চ নাম্বার!
কৃতজ্ঞতা আদায় করলাম মহান আল্লাহর দরবারে, মানব সেবার এমন উত্তম প্রতিদান দেয়ায়। খুব আনন্দ অনুভূব করি মানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে!!

রক্তদাতাঃ Akmal Rawi অভিজ্ঞতাঃ ১৩ (সূচিপত্র)

সবচেয়ে স্মরণীয় রক্তদান। সেটা ২০১৬ সালের এপ্রিলের কোন এক তারিখে। রাত তখন প্রায় ২টা।

আমার পরিচিত এক সাংবাদিক ভাই ফোন দিয়ে বলেন যে আর্জেন্ট রক্ত দিতে হবে ওনার এক পরিচিত ভাইয়ের ভাগ্নেকে। তখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিড টার্ম পরিক্ষা চলছিল। তাও কোন কিছু চিন্তা না করে আমি বাসায় কাউকে না বলে রাত আড়াইটার সময় বের হই।

বের হয়ে তো আমি বেকায়দায় পরে গেলাম। কোন গাড়ী নেই, কোন রিক্সা নেই। তাই আল্লাহর নাম নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম এবং ঠিক তখনই পেলাম একটা বালুভর্তি ট্রাক যে কিনা আমাকে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে, কিন্তু অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত। এরপর আমি কোনরকমে একটা সিএনজি নিয়ে পৌছালাম চট্টগ্রাম মেডিকেল এবং রক্ত দিয়েও দিলাম এবং সব শেষ করতে করতে ভোর হয়ে গেল। এদিকে আমার পরিক্ষার সময় ও শুরু হবে এবং হাসপাতাল থেকে বাসায় গিয়ে পরিক্ষার জন্য রেডি হয়ে পরিক্ষাও দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ পরিক্ষাও ভালো হয়েছে আর সে ছেলেটিও ভালো সুস্থ আছে।

রক্তদানের সবচেয়ে স্মরণীয় এবং সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগের অভিজ্ঞতার দিনটি ছিল ০৩.১০.২০১৬। আগের দিন বিকাল থেকেই হন্য হয়ে রুগী খুঁজছিলাম ফেইসবুকের হোম পেইজ পুরো ঘেঁটে ফেললাম কিন্তু রুগী খুঁজে পাচ্ছিনা। শেষে সন্ধ্যায় আক্তার হামিদ ভাইকে কল করি, যেভাবেই হোক যেমন করে হোক আমাকে একজন রুগী খুঁজে দিন। সময় রাত ১২ টা থেকে সকাল ১০ টার মধ্যেই। চট্টগ্রামের যেকোন প্রান্তে এই সময়ের ভিতর আমি রক্ত দিতে পারবো। উনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন রুগী পাওয়া মাত্র আমাকে নক করবেন।

রাত প্রায় ১ টায় একটা নাম্বার থেকে কল আসে এবং বলে হামিদ ভাই থেকে আমার নাম্বার নিয়েছে আমি কি সকাল ৮ টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যালে ব্লাড দিতে পারবো কিনা। এক কথায় হ্যাঁ বলি আর আমি ঠিক ৮ টায় ওখানে উপস্থিত থাকবো বলি। সারারাত চোখ বুঝতে পারিনি যেভাবেই হোক ভোরে উঠে যেতে হবে সকাল ৮ টায় হসপিটালে যাবার আগে কয়েক জায়গায় যাওয়া আমার জন্য খুব জরুরী। আমি ছিলাম পতেঙ্গা এলাকায়। ভোর ৪.৩০ বাসা থেকে বের হয়ে আসি। হালিশহর এলাকায় একটা জরুরী কাজে আসি এখানে জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করি। এখানে কাজ শেষ করে ৬.৩৫ মিনিটে এখান থেকে রওনা দেয় আমি আগ্রাবাদ চৌমুহনীতে আরেকটা জরুরী কাজে। ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে দাঁড়িয়ে থাকলে কাজ শেষ করে সময় মত হসপিটালে যেতে পারবো না। এখানে কাজ শেষ করে যখন হসপিটালে রওনা দিলাম ততোক্ষণে পুরো বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে গেছি আমি। পকেটে টাকা ছিল সামান্য কিছু টাকা। তার উপর ভুল করে দৌড়ে গিয়ে এসি বাসে উঠে পড়ছি ৫ টাকার ভাড়া ২০ টাকা দিতে হয়েছে । এসে জিইসি মোড়ে নামলাম। বৃষ্টিতেই হেঁটে রওনা দিলাম।

এই রোড টা আমি তখন খুব কম চিনতাম। তাই বাধ্য হয়ে রিকশা নিলাম। লোকটি ২০ টাকার বিনিময়ে অল্প একটু রাস্তা এসে আমাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যালের সামনে নামিয়ে দিলো। এখন রুগীর লোককে আমি কল দেই উনি কল ধরে না। এই দিকে আমার হাতে সময় খুব কম। যত দ্রুত সম্ভব রক্তদান করে ঢাকায় বাস ধরতে হবে। পকেটে তখন আর ভাংতি টাকা নাই যে নাস্তা খাবো। পরে ফেইসবুকে ঢুঁকে হামিদ ভাইয়ের ওয়ালে দেখলাম একটা পোস্ট গতকাল রাতে করা হয়েছিল। আমি ভাবলাম এই পোষ্টের রোগীই হয়তো আমাকে কল দিয়েছিল। উক্ত নাম্বারে কল দিলাম। একটা আপু কল ধরলো। বললাম আমি ব্লাড দিতে চাচ্ছি উনি আমাকে ওয়ার্ডে যেতে বললেন। সেখানে গেলাম। রোগী ওনার কেউ না। পাশের বেডের একজন রোগী যাকে অপারেশনের জন্য ওটিতে নিয়ে গিয়েছে যার কেউ নাই, রোগী একা কিন্তু ডাক্তার বলছে ২ ব্যাগ রক্ত লাগবে, এখনই লাগবে।

উনাকে নিয়ে OT তে গেলাম। ডাক্তারের সাথে কথা বললাম, ডাক্তার রোগীকে ব্লাডের স্যাম্পল দিলেন আর বললেন ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে ৫০০ টাকা জমা দিয়ে ব্লাড দিতে। যেহেতু রোগীর কেউ নাই, সেহেতু আমাকেই এটা করতে হবে। কিন্তু ব্লাড ব্যাংকে পৌছনোর আগেই সকাল আগের রোগীর আত্মীয় কল দিলেন। উনি বললেন যে, উনি ব্লাড ব্যাংকে আছেন। গিয়ে উনাকে সবকিছু বিস্তারিত খুলে বললাম আর বললাম আমার হাতে সময় কম, আমাকে ঢাকায় যেতে হবে খুব জরুরী। উনি আমার কাছে থেকে রক্তের স্যাম্পল আর রিসিটটা নিলেন আর আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে অপারেশনের এই রোগীর সব দায়িত্ব উনি নিবেন। কোন চিন্তা করতে না করলেন। বললেন, এই রোগীর দায়িত্ব আমার, আপনি চিন্তা করবেন না। যত কিছু করতে হয় আমি করবো, কিন্তু আপনি আমার রোগীকে রক্ত দিন। আমি ওটা দেখতেছি। উনার উপর বিশ্বাস ভরসা রেখে আমি ওনার রোগীকে রক্ত দিয়ে ১৩তম বার রক্তদান সম্পন্ন করলাম। রক্তদান শেষে উনি আমাকে ২ টা ডাবের পানি খাওয়ালেন।

উনার থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঢাকার উদ্দেশ্যে। পরে ওই ভাই এর কাছে থেকে ওই রুগীর ও খবর নিলাম নিজে যাকে রক্ত দিয়েছিলাম তার খবর নিলাম কল করে। আল্লাহ এর রহমতে দুজনই ভালো আছে। এই ভাই এর নাম তোহিদুল ইসলাম তুহিন। এখন সে আমার ভাই হয়ে গিয়েছে, যোগাযোগ আছে থাকবে চিরদিন। এই দিনটি আমার জন্য অনেক বেশি স্পেশাল ছিল আর এই স্পেশাল দিনে আমি চট্টগ্রামে রক্তদান করবো এটা অনেক আগে থেকেই প্ল্যান ছিল। কারন এই দিনটি ছিল আমার সব চাইতে প্রিয় আর ভালোবাসার মানুষটার জন্মদিন। আর সেদিন রক্তদানের অনুভূতি কেমন ছিল সেটা সত্যি আমি লিখে বা বলে প্রকাশ করতে পারবো না সেই অনুভূতি। অনেক বেশি আত্মতৃপ্তি নিয়ে সেদিন ঢাকার বাসে উঠেছিলাম। আজ পর্যন্ত আমি ১৩ বার লাল রক্ত আর একবার প্লাটিলেট রক্ত দান করার সুযোগ পেয়েছি। ইনশাআল্লাহ যতদিন সুস্থ আছি ততদিন নিজেকে এই মহৎ কাজে নিয়োজিত রাখবো। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার ভালোবাসার মানুষটার জন্য ও দোয়া করবেন। যেনো প্রতিবছর ওর জন্মদিনে ওর শহরে রক্তদান করার সুযোগ পাই আমি।। অনেক বেশি আনন্দ আত্মতৃপ্তি পাই রক্তদান করে। সবাই ভালো থাকবেন।

সময়টি ২০১৪ সালের অক্টোবরে। আমার বাবা এক্সিডেন্ট করেন সকালে। উনাকে গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নিয়ে আসা হল। প্রচুর রক্তকরণ হয়, ফলে অপারেশনের সময় ২ ব্যাগ এ পজেটিভ রক্তের প্রয়োজন পড়ে।

আমার রক্তের গ্রুপ এ পজেটিভ হলেও, সুঁই ঢুকানোর ভয়ে দিতে পারিনি। একটা পোস্ট করলাম ফেইসবুকে। তখন পোস্ট থেকে ফোন করে একজন স্বেচ্ছায় রক্তদাতা, উনি তাঁর নিজের বন্ধু সহ ২ জন নিয়ে আসে, বাবার অপারেশন হয়। আর ভিতরে ঠিক ততটুকু অনুপ্রাণিত হলাম, যতটুকু মনে ভয় ছিল সূচের। সেদিন থেকে ভেবে নিয়েছি ভয়কে জয় করবোই একদিন।

১ মাস পর। ফেইসবুকে একটা পোস্ট দেখলাম, রাত তখন ৯ টা। এক ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুর জন্য রক্ত প্রয়োজন, পোস্ট দেখে ফোন দিলাম রোগীর আত্মীয়কে। রোগীর বৃদ্ধা নানু কল ধরলেন। ফোনে উনাআর কান্না শুনে আমি আর সহ্য করতে পারিনি।

বৃষ্টিও পড়ছিল সেদিন, আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল উত্তপ্ত। বাসায় বের হতে বারন করছিল, তারপরও মিথ্যে বলে বের হলাম। চট্টগ্রাম মেডিকেলে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর রাত ১২টার দিকে রক্তদান করলাম। আর সে দিন বুঝলাম রক্তদানের সে কি মহা আনন্দ!

রক্ত দিয়ে প্রায় ৬ কিলোমিটার পথ হেঁটে বাসায় পৌঁছলাম। তবে রোগীর লোকের সাথে এখন তেমন কোন যোগাযোগ নেই, কিন্তু এখনো রক্তের প্রয়োজন হয় বাচ্চাটির। চট্টগ্রাম আসলে আমাকে ফোন দেয়, রক্তের প্রয়োজনে। আর আমিও মাঝে মাঝে ফোন দেই বাচ্চাটির খবর নেবার জন্য। তবে বাচ্চাটি এখনো বেঁচে আছে শুনেই তৃপ্তি পাই।

আমি এখন পর্যন্ত ৮ বার এ পজেটিভ রক্তদাতা।

পরিশেষে বলি,
"রক্ত দিন, জীবন বাঁচান,
জাগ্রত হোক মানবতা, বাঁচুক রোগীর প্রাণ"।

পরিচিত এক ভাই ফোন দিয়ে জানালেন যে ‘ও পজিটিভ’ রক্তের প্রয়োজন। ও পজেটিভ রক্তদাতাদের একটাই সমস্যা, হাসপাতালে পৌছে দেখতে হয় রক্ত ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। গত পরশুও এমন ঘটনা ঘটেছে, গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

আজ আবার ফোন, ঢাকা মেডিকেলে দিতে হবে, ছোট একটি মেয়ের জন্য। স্ত্রীকে বললাম, রক্ত দিতে যাচ্ছি। সে বলল, চলো আমিও যাই, দেখে আসি মেয়েটাকে।

মাসের শেষ দিক, হাত প্রায় খালি। পকেটে একটা মাত্র ৫০০ টাকার নোট। আর কিছু ভাংতি টাকা। হাসপাতালের সামনে নেমে মনে হল, খালি হাতে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? কিছু আপেল কমলা কিনেনিলাম, চলে গেল ৩৫০ টাকা।

বার্ণ ইউনিট মনে হয় ঢাকা মেডিকেলের সবচেয়ে ভয়াবহ ইউনিট। রোগীদের দিকে তাকানোর অবস্থা নেই। বেশ কষ্ট করেই রোগীর মাকে খুজে বের করলাম। ভুল চিকিৎসার জন্য আজ মেয়ের এই অবস্থা। শরীর পুড়ে গেছে ওষুধের প্রভাবে। হাসপাতালে আছেন মেয়েকে নিয়ে আজ দু-মাস হতে চলল। মেয়ের বাবা দেশের বাড়ীতে গেছে জমি বিক্রি করে টাকা আনবে বললে। সাত বছরের ছোট্ট মেয়ের কিছুতেই হাসপাতালে মন টেকে না। শুধু বাড়ি যাবার বায়না। হাসপাতালের খাবারও খেতে চায় না কিছু।

রক্তদান কেন্দ্রের ডিউটির পরিবর্তন হয়েছে, পরের জন এখনও আসেনি। বসতে বলল কিছুক্ষণ। এর মধ্যে মেয়ের মা এসেছে, তার মুখে এক টুকরো হাসি। কি ব্যাপার জানতে চাইলে বলল, আপনি আপেল-কমলা নিয়ে এসেছেন, মেয়ে খুব মজা করে খেয়েছে আজকে।

এর মধ্যেই আমাকে ডাকল রক্তদানের জন্য। ফি দিতে হবে ৩০০ টাকা। মেয়ের মা তার আঁচল থেকে ১০/২০ টাকার নোট দিয়ে পূরণ করা ৩০০ টাকা দিল হাসপাতালে স্টাফকে। ইচ্ছা হচ্ছিল এই টাকাটা আমি দিয়ে দেই, কিন্তু হায়রে কপাল! এমন দিনে ঘটলো এই ঘটনা, আমার পকেটে ৩০০ টাকাও নেই। রক্তদানের তৃপ্তি, কিন্তু আবার ৩০০ টাকা দিতে না পারার চরম ব্যর্থতা – এই দুই অনুভূতি নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

রক্তদাতাঃ Odhora Khan Chaity অভিজ্ঞতাঃ ১৭ (সূচিপত্র)

২ বছর আগের ঘটনা, তখন আমি ফরিদপুরে থাকতাম। এটা আমার কাছে স্মরণীয় ঘটনা তার সাথে সাথে বিরক্তিকর ঘটনাও।

ফেসবুকে আমার এক বন্ধু বি পজিটিভ রক্ত লাগবে জানিয়ে একটা স্ট্যাটাস দেয় । রোগীর নাম্বার দেয়া থাকে নিচে । আমি নাম্বারে ফোন দিলাম একজন ছেলে ফোন ধরে । আমি তাকে বললাম আমি রক্ত দিতে ইচ্ছুক । তিনি আজকে বিকাল ৪ টার মধ্যে ফরিদপুর ডায়বেটিকস হসপিটালে আসতে বলেন । যথাসময়ে আমি উপস্থিত থাকি কিন্তু সেখানে কাউকেই পেলাম না । নাম্বারে ফোন দিয়ে জানতে পারলাম অপারেশন আজকে হবে না কারন ডাক্তার কিছু পরিক্ষা করতে দিয়েছে । অপারেশন কালকে হবে । পরের দিন সকালে ফোন দিলাম, তিনি আমাকে আবার ৪ টায় যেতে বললেন । আমি আমার টিউশন বাদ দিয়ে তাকে ৩:৩০ এর দিক ফোন দিলাম , আমি হাসপাতালে আসছি এটা জানানোর জন্য । তিনি আমাকে বললেন পরিক্ষায় খারাপ কিছু দেখা গেছে, তাই ২ দিন পরে অপারেশন হবে । ওহ ! আমাকে জানাবেন - এটা বলে ফোন রেখে দিলাম। ২ দিন পর দুপুর ৪ টার দিক অন্য একটা নাম্বার থেকে ফোন আসে । ফোনটা ছিলো রোগীর মেয়ের । তিনি আমাকে এখনই হাসপাতালে আসার কথা বলেন । আমি তাকে বললাম, আপু মাত্র কলেজ থেকে এসেছি খাওয়া হয় নাই । একটু পরে আসলে হবে?
উনি বললেন, "আপনি আসেন খাওয়ার ব্যবস্থা হবে ।"

আমি যেয়ে দেখলাম রোগী ওটিতে অপারেশন এখনও শুরু হয় নাই । আমাকে বসতে বলা হল আর ফ্রুটিকা খেতে দেওয়া হল । প্রায় আধাঘন্টা পর রোগীর অপারেশন শুরু হলো কিন্তু আমাকে ডাকা হল না । সাড়ে ৫ টার কিছুক্ষণ আগে অপারেশন শেষ হল । আমি ততক্ষণ বসেই ছিলাম । পরে আমাকে বলা হল দুঃখিত রক্ত লাগে নি আপনি চলে যান । আমি শুধু বললাম, তাহলে এতক্ষণ আমাকে বসায় রাখার মানে কি হইল! আমাকে অযথা এতক্ষণ বসিয়ে রাখলেন কেন? আপনারা যখন যা ইচ্ছা বলবেন আর আমাকে সেটা শুনতে হবে!!

যাদের রক্ত লাগে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা অনেকেই ফোন দিয়ে আপু এখনই আসেন বলে অনেকক্ষণ বসাই রাখেন । আপনারা বলার সাথে সাথেই আমরা চলে আসি, তাহলে এই বিড়ম্বণা কেন? আমাদের অনেকের অনেক ধরনের সমস্যা থাকা স্বত্ত্বেও আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করি । এই ধরনের হেনস্তা না করলে রক্তদানে সবাই আরও বেশি উৎসাহী হবে ।

রক্তদাতাঃ Porag Miazee অভিজ্ঞতাঃ ১৮ (সূচিপত্র)

১২ই জানুয়ারী ২০১২। বৃহস্পতিবার। রাত ১২:০৮। ঠিক তখনি অপরিচিত একটি নাম্বার থেকে ফোনে কল! খানিকটা দ্বিধা করে রিসিভ করলাম কলটি। রিসিভ করে কোন কিছু বুঝার আগেই কানে যা ভেসে এল তা ছিল একটি আর্তের চিৎকার, "ভাই আমার ছেলে কে বাঁচান।"
শুধু এটুকু বলেই লোকটির মুখ থেকে কথা শেষ। আর কিছুই বলছে না। লাইন কেটে গেল।
রাত ১২:২৪ তে আমি ঐ নাম্বারে কল দিলাম এবং জানতে পারলাম, উনার ছেলে এক্সিডেন্ট করেছে এবং দ্রুত এক ব্যাগ হলেও রক্ত দরকার। নাহলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না। রোগী আছে কুমিল্লা মেডিক্যালে, কিন্তু আমি থাকি কচুয়া (চাঁদপুর)। আমি উনাকে বললাম, আমি আপনাকে ৫ মিনিট পরে জানাচ্ছি। কলটা কাটার পর আমার রুমমেটেরা জানতে চাইলো কি হয়েছে। আমি পুরো ব্যাপার খুলে বললাম। আমার তখন শরীরের ওজনও কম। আর আমার সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষাও চলছে।

কিছুক্ষণ পর আবার কল দিলাম, "ভাই, আমি রক্ত দিবো।"
আমি শীতের পোষাক পরে বের হয়ে যাবো, তখন দেখি যে আমার ফ্রেন্ডও আমার রেডি হয়ে গেছে। আমাকে বলল, তুই এমন মহৎ কাজটা করবি, আমি থাকবো না তোর পাশে - এটা কি হয় বল!!

যাইহোক, দুই ফ্রেন্ড বের হলাম রক্ত দানের উদ্দেশ্যে। আল্লাহর রহমতে বাসা থেকে বের হয়েই একটা সিএনজি পেলাম। যখন সিএনজিতে উঠলাম তখন রাত প্রায় ১টা। কনকনে শীতে প্রায় ১২০ কিঃমিঃ রাস্তা পারি দিতে হবে। রোগীর আত্মীয়ের কল কিছুক্ষন পর পর। আসলেই আমি যাচ্ছি কিনা!

রাস্তার সব ঝামেলা শেষ করে যে হাসপাতালে পৌঁছালাম রাত ২:৪০ টায় প্রায়। রোগীর আত্মিয়ের সাথে দেখা হতেই লোকটির চোখ মুখ ছোট হয়ে গেল। বলল, বাবা, আপনার ওজন তো বেশি না, পরে যদি আপনার কোন সমস্যা হয়?
আমি হেসে বললাম, "আপনারা টেনশন নিবেন না। আমি এর আগও একবার রক্ত দিয়েছি (যদিও মিথ্যা বলেছি)। আর আমার শরীরে ওজন না থাকলেও মনে বেশ ওজন আছে। ইনশাআল্লাহ্ আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। "

প্যাথলজিতে গেলেন আমাকে নিয়ে। ডোনার ফরম পুরন করে টেকনোলজিস্টকে ফরম দিলে ওনি তো কোনভাবেই আমার রক্ত নিবেন না। পরে অনেক বুঝিয়ে বললাম যে আমি এর আগেও একবার রক্ত দিয়েছি আর আমি নিজ থেকেই আগ্রহী। আপনি নিতে পারেন। আর আমার কিছু হলে আমি নিজেই দায়ী থাকবো,

তবুও আপনি রোগীকে বাঁচান। যাক উনার মনে হয় কিছুটা মায়া হল। রাত ৩:১০ টায় আমি জীবনের প্রথম সুচের ভয় জয় করে ফেললাম। প্রায় ১০ মিনিট রক্ত নেবার পর মনে হল ব্যাগটা পুর্ন হয়েছে, আর আমার সুস্থতা দেখে সবার মুখে সেরকম একটা চিলতে হাসি। সাথে আমিও হাসলাম। আর ওনাদের সত্যিটা বলে দিলাম যে এটাই আমার জীবনের প্রথম রক্তদান। সবাই তো আমাকে কোলে নিবে না মাথায় নিবে ভাবছে!

সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। রোগীর বাবা ভাড়ার টাকা দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি না নিয়েই চলে আসলাম। যে সিএনজি নিয়ে গিয়েছিলাম, উনার সাথেই আবার ফিরে এলাম নিজের গন্তব্যস্থলে। সিএনজি থেকে নেমে ড্রাইভারকে বললাম, "ভাড়া কত দিব? আমরা তো স্টুডেন্ট। আর আপনি তো সব দেখলেন।" ড্রাইভার বলল, "যে কাজ আপনি করেছেন ভাই তার শরীক আমিও হতে চাই। আমার রক্তের গ্রুপ যদি জানতাম তাহলে আমি নিজেও রক্ত দিয়ে আসতাম। আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাদের একজন ভেবে আমাকে আর টাকাটা সাধবেন না। আমিও এই ভালো কাজটার শরীক হতে চাই।"

তারপর ড্রাইভার ভাইটিকে স্যালুট দিয়ে বাসায় এসে জমবেশ একটা ঘুম দিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি করে মোবাইলটার দিকে তাকালাম, ভাবলাম হয়তো রোগীর আত্মীয় আমাকে কল দিয়েছে। কিন্তু আজ অব্দি আর একটি কলও আসেনি সে নম্বর থেকে।

যখনই জীবনের প্রথম রক্তদানের কথা মনে পরে তখনই এ কথাগুলো বার বার মনে পরে।

রক্তদাতাঃ মশিউর মিম অভিজ্ঞতাঃ ১৯ (সূচিপত্র)

আমি সবে মাত্র তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি। আমার এক বন্ধু বললো তার বোনের বাচ্চা হবে তাই ব্লাড লাগবে বি পজিটিভ। কেউ রাজি হচ্ছিল না। সবাই ভয় পাচ্ছিল কেউ দিতে পারবে কিনা। আমি সাহস করে বলে ফেললাম আমি দিবো। তখন ব্লাড ডোনেটের জন্য নুন্যতম ১৮ বছর এবং ৫০ কেজি হতে হয় – আমি জানতাম না। ব্লাড লাগবে ধানমন্ডি বাংলাদেশ মেডিকেলে। যে ভাবা সেই কাজ। আমি ব্লাড দিতে চলে গেলাম কিন্তু আমার লো-পেসারের কারনে ব্লাড নিলো না।

তার কিছু মাস পর থেকেই শুরু হল রক্তদান। একবার মনে আছে বাবা তখন ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি। মেডিকেলের লিফটে এক অপরিচিত বয়স্ক বড় ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো। তার শালিকার জন্য বি পজিটিভ রক্ত লাগবে। কোয়ান্টামে যাচ্ছে ব্লাড কিনতে। আমি বললাম আপনার রক্ত কেনার দরকার নেই। আমি আপনাকে ব্লাড দিবো। তারপর তাকে গায়ে পড়ে উপকার করলাম। সে ভাই আজও আমাকে ফোন দেয়।

অন্য একটা ঘটনা বলি। আমার বাবা তখনো খুব অসুস্থ। আমি ব্লাড দিতে গেলাম সাত মসজিদ রোড ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে। এক ক্যান্সার আক্রান্ত ভাই। বাড়ি গাজিপুরে। তার বোন ফোন দিয়ে বললো খুব ইমার্জেন্সি ব্লাড দিতে হবে। তাই আমি খুব দ্রুত চলে যায়। আব্বু ফোন দিয়ে জানতে চাইল আমি কোথায়। আব্বুকে বললাম আমি ব্লাড দিতে আসছি। আব্বু খুব খুশি হল এবং বললো কিছু খেয়ে নিতে। ব্লাড দিয়ে যেন সোজা বাসায় চলে যায় সেটা বলতেও ভুল হল না। আজ বাবা নেই কিন্তু তার কথা আজও আমার কানে ভাসে।

রক্তদাতাঃ Roni CH অভিজ্ঞতাঃ ২০ (সূচিপত্র)

জীবনের প্রথম রক্তদান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০১২ সালের ১৮ জানুয়ারিতে।

আমার দাদুর অপারেশন হবে। সেজন্য রক্তের প্রয়োজন ছিল ৬ ব্যাগ। কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তারপরে কলেজের এক বড় ভাইকে জানাই। তিনি বলেন চিন্তা না করতে। ফেইসবুকে পোস্ট করে দেয়া হয় রক্তের রিকুয়েস্ট লিখে। কিছুক্ষণ পর থেকে কল আসতে থাকে। অপরিচিত অনেকে কল দিয়ে বলছেন, আপনার মনে হয় বি পজেটিভ রক্তের প্রয়োজন। আমি দিব।
এই ভাবে কল দিয়ে দিয়ে ৬ জন রক্তদাতা হাসপাতালে এলেন যা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ব্লাড ব্যাংকে বসে আছি আর রক্তদাতারা রক্তদান করছেন।

এমন সময় একটা লোক এসে বলল, আমার মেয়ের জন্য এক ব্যাগ এ পজেটিভ রক্তের প্রয়োজন। কেউ কি দিতে পারবেন? তার সিজার হয়েছে এখনই রক্তের প্রয়োজন।
উনার কথা শুনে একটা কথা মাথায় এল, আমার এক কলে যদি আমার দাদুর জন্য ৬ জন রক্ত দিতে আসে আর আমি এক ব্যাগ দিয়ে দিলে কি বা হবে! সাথে সাথে বললাম, আমি রক্ত দিব। রক্ত দান করতে ঢুকে গেলাম।

ওই রক্তদান আমার জীবনের স্মরণীয় কারন, সুঁই খুব ভয় পেতাম। ওই দিন সুইকে জয় করতে পেরেছিলাম। রক্ত দেওয়ার পর থেকে দুই দিন যোগাযোগ হয়েছিল রোগীর লোকের সাথে, তাও মেডিকেলে গিয়ে।

ওই দিন এর পর থেকে চেষ্টা করি মানুষের বিপদে মানুষকে একটু সাহায্য করতে। এখন পর্যন্ত ৮বার রক্ত দিলাম।

রক্তদাতাঃ Afia Mubasshira Momi অভিজ্ঞতাঃ ২১ (সূচিপত্র)

রক্তদানের ক্ষেত্রে সবসময়ই আমার একটা ভয় কাজ করে আর সেটা হল ডাক্তার শেষ পর্যন্ত রক্ত নিবে কিনা! আমার ২য় বার রক্তদানের সুযোগ হয়েছিল গতবছর রমজানের মধ্যে। ইফতারের পর এক ভাই ফোন করে উনার বাবার জন্য রক্ত লাগার কথা জানালেন যেটা পরের দিন দুপুরের মধ্যে দিতে হবে। আমার রক্তের গ্রুপ এমন আহামরি দুর্লভ না। ও পজেটিভ ব্লাড খুব সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু উনি নাকি এর আগেও আরও কয়েকজনকে ফোন করেছেন এবং তারা না করে দিয়েছেন। রমজানে রোজা রেখে রক্ত দেয়া যাবে কিনা তাই নিয়ে অনেকেই সঠিক জানেন না। আর তাই ডোনারও পাওয়া কষ্টকর। আমি নিজেও জানতাম না। বললাম একটু পরে কনফার্ম করছি। ইফতারের পর তখন অনলাইনে এক আপুকে পেলাম, যিনি এইসব ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন। উনি বললেন, এটা কোন সমস্যা না। তারপর ইউটিউব এর ভিডিওগুলোও দেখলাম। সাথে সাথে ফোন দিয়ে কনফার্ম করলাম।

দুপুরের দিকে রোজা রেখেই রক্ত দেয়ার জন্য গেলাম এবং যথারীতি ডাক্তার আমাকে দেখে ভ্রু কুচকালেন। "আপনি রক্ত দিবেন?"
আমার উষ্চতা কিছু ৫ ফিটের মত আর ওজন ঠিক যতটুকু হলে ব্লাড দেয়া যায়। আবার ৪ মাস হতে নাকি ৪ দিন বাকি। এরপর আরও কতক্ষণ জেরার পর রোজা ভেঙ্গে ফেলব কিনা জানতে চাইলেন। না করলাম। আর ভয় শুরু হল। এরা কি আমার রক্ত নিবেনা? শেষ পর্যন্ত রক্ত দিলাম। বারবার করে সবাই বললেন যেন খারাপ লাগলে রোজা ভেঙ্গে ফেলি। আল্লাহ্‌র কাছে দুয়া করছিলাম যেন সুস্থ থাকি আর ওইদিনের চেয়ে বেশি সুস্থ আমি কখনই ছিলাম না মনে হয়। রোজা রেখে শিরি ভেঙ্গে হেটে, রিক্সায় জার্নি করে বাসায় এসেও আমি সুস্থ ছিলাম। এমন কি এতটুকু ক্লান্তিও হচ্ছিল না আল্লাহ্‌র রহমতে।

তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ শুক্রবার। আমার আপুর পাশের বাসার এক দিদির সিজারের জন্য কিছুদিন পরে রক্ত লাগবে। আপুর কাছে ঐ দিদি জানতে পেরেছিলেন যে আমি নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্ত দান করি। তাই আমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলেন যেন উনার রক্তের প্রয়োজনে আমি রক্ত দিই।

তখন আমি থাকি নরসিংদীতে। এর মাঝে ঐ দিদির সাথে কথা বলে জেনে রেখেছি কবে রক্ত লাগবে। সেই তারিখ অনুযায়ী নরসিংদী থেকে ঢাকায় চলে আসি রক্ত দিতে। আপুর বাসা গোলাপবাগ, সেখান থেকে ঐ দিদির বরের সাথে যাই উত্তরা। মেডিকেল যাওয়ার পর রক্তের সব কয়টি পরীক্ষা করা হয়, রিপোর্ট ভালো আসে। আনন্দের সাথে যাই রক্ত দিতে, কিন্তু হঠাৎ সমস্যা দেখা দে – পেসার লো(৬০-১০০)। তাই আমার রক্ত নিবে না। আমিও নাছরবান্দা রক্ত দিবই। আমি অনেক বলেও হাসপাতালে রাজি করাতে পারছিনা। পরে দাদাকে নিয়ে বের হলাম- ডাবের পানি, ডিম খেলাম, আমার আগ্রহ দেখে দাদা হিন্দু ধর্মের হয়েও আমাকে নিয়ে এক হোটেলে গরুর গোশত খাওয়ায়। দুই ঘন্টা ব্যাপী প্রচুর খাবার খেয়ে আবার আসি হাসপাতালে। পেশার মাপার পর (৮০-১১০)বা তার মাঝে। তারপরও রক্ত নিবে না। আমি যখন বললাম আজ রক্ত না দিয়ে এখান থেকে যাবো না, অনেক বলেও আমাকে সরাতে না পেরে অবশেষে আমার শরীর থেকে রক্ত নেয় এবং লিখিত নেয় যে আমার কোনো কিছুর জন্য হাসপাতাল কতৃপক্ষ দায়ী নয়।

রক্ত দিয়ে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে বাসায় আসার সময় সিএনজি জ্যামে পরে। তখন একটা ঘুম দেই। দেড় ঘন্টা পর ১লা ফাল্গুনে ঘুড়তে বের হই সন্ধ্যায়। একবারের জন্যও খারাপ লাগেনি, ভালো লেগেছে রক্তটা দিতে পেরে।

রক্তদাতাঃ Arif Gifari অভিজ্ঞতাঃ ২৩ (সূচিপত্র)

৫ই আগষ্ট, ২০১৪।

রাত ১১ টায় রংপুর থেকে ঢাকার বাস। পরের দিন ৬ তারিখ আমার একমাত্র ভাগ্নের জন্মদিন। বিকেলে বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ ফোন আসলো একটা। রংপুর মেডিকেলে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত এক বাবার জন্য এ নেগেটিভ রক্ত লাগবে ৩ ব্যাগ। অনেক দিন থেকেই রক্তদানের অপেক্ষায় ছিলাম।তাই সুযোগটা আর হাতছারা করলাম না। সাথে সাথে বন্ধু রুমেলকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যাই। রক্ত দিবো, খুব খুশি খুশি লাগছিলো। হাসপাতালে যাওয়ার পরে রোগীকে দেখলাম। অনেক গরীব ছিলেন ওনারা। পকেটে কিছু টাকা ছিলো। রুমেলকে বললাম, “মেডিকেল মোড়ে ভালো আপেল পাওয়া যায়, নিয়ে আয়তো কিছু। শোন, একটা পানির বোতল আনিস”। ও চলে গেলো।

এদিকে আমার ক্রস ম্যাচিং শেষ হল। রুমেল আসার পর ওদেরকে আপেলের থলেটা দিয়ে রক্ত দিতে গেলাম। এর মাঝেই আমি আর এক ব্যাগ এ-নেগেটিভ রক্ত ম্যানেজ করে দেই ওনাদেরকে। রক্ত দেয়ার সময় রুমেলের বাসা থেকে ইমারজেন্সি ফোন আসায় সে চলে যায়। আমি একলা পরে রই। যখন সুঁই ফোটায়, সত্যি বলতে আমার একটুও ভয় লাগে নি। এগুলো আমার কাছে কেন জানি কিছুই মনে হয় না। তবে, রক্ত দেয়ার সময় একটু কেমন যেন লাগছিল।

রক্ত দেয়া শেষ হলে লোকটা আমাকে ১০ মিনিট শুয়ে থাকতে বলেন আর বেশি বেশি করে পানি খেতে বললেন। আমি পানি খাই আর রেস্ট নেই। রেস্ট নিয়ে রোগীর সাথে দেখা করতে যাই। রোগী আমার দিক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন আর ওনার বউ আমার মাথায় হাত বুলোতে থাকেন। সেই সময় যে কি এক অনুভূতি হচ্ছিলো, তা আমি বলে বুঝাতে পারবনা। ওনাদের কাছে বিদায় নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হই। বাসায় ঢুকে খাওয়া দাওয়া করে রাতের বাসে ঢাকায় রওনা দেই। এটা আমার ১ম রক্তদানের গল্প। আল্লাহর রহমতে আমি এ পর্যন্ত ৭ বার রক্তদান করে ফেলেছি। ইচ্ছা আছে কমপক্ষে ১০০ বার রক্তদান করার। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন এবং চারপাশ না ভেবে রক্তদান করুন, একটি জীবনে আলো ফিরিয়ে আনুন।

রক্তদাতাঃ Anamul Hague অভিজ্ঞতাঃ ২৪ (সূচিপত্র)

আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে আমিই জয়ী। আজকে ১৪ তম বার রক্ত দান করলাম।

এর আগে যতবার রক্ত দান করেছি তা ছিল খুব সহজ। আজ যেন জীবনের সাথে যুদ্ধ করে রক্ত দান করলাম। ঢাকায় এসেছিলাম পরীক্ষা দিতে, ইচ্ছে ছিল পরীক্ষার পর ভাগনের সাথে "হাতির ঝিলে" বেড়াতে যাব কিন্তু হঠাৎ সম্ভবত ৬ টার দিকে স্ট্যাটাস দিলাম কারো রক্ত লাগলে দিব। তারপর গোসলে গেলাম এবং গোসল শেষে দেখি "সুব্রত" ভাই কমেন্টে লিখেছে বারডেমে একজন রোগীর ৩ ব্যাগ ব্লাড লাগবে। ভাবলাম জীবনে বেঁচে থাকলে হাতিরঝিলে যেতে পারব কিন্তু এই বার রক্ত দেওয়া মিস হলে আর ফিরে পাবো না।
দ্রুত ভাত খেয়ে রওনা দিলাম বারডেমের উদ্দেশে। রামপুরায় আমার ভাগনে "রতন" লেগুনায় উঠে দিল। মৌচাকে নেমে পড়লাম বিপদে শাহবাগের বাস পাচ্ছিলাম না। যেহেতু ঢাকায় নতুন সেজন্য অনেককে জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু সমাধান পাচ্ছিলাম না। এদিকে রাজশাহী যাওয়ার তাড়া। ১১ টার অগ্রিম টিকিট আগেই নিয়েছিলাম।

অবশেষে আমার বন্ধু " জলিল" কে ফোন দিলাম এবং ওর পরামর্শ অনুযায়ী বাংলামোটরে গেলাম। সেখানে ট্রাফিক পুলিস কে জিজ্ঞেস করে বাসে বারডেমে পৌঁছালাম। রোগীর লোক নিচে আসলে দুতালায় গেলাম ব্লাড ব্যাংকে। তখন সময় প্রায় ৮:৩০। কিন্তু ব্লাড ব্যাংকের কর্তব্যরত ব্যক্তি ১০:৩০ এর আগে রক্ত নিবে না। কারণ রক্ত ফ্রিজে রাখা যাবে না। ভাবলাম এতো কষ্ট করে হেরে গেলাম। অনেক রিকোয়েস্ট করে রাজি করালাম ১০ টায় নেওয়ার। জন্য। অনেককে ফোন দিয়ে জেনে নিলাম কমলাপুর যেতে কতক্ষণ লাগবে। সবাই বলল প্রায় ২০ মিনিট। এই ফাঁকে রোগীর সাথে দেখা করে নিলাম। যাইহোক ঠিক ১০ টায় ব্লাড দিতে শুরু করলাম আর রোগীর লোককে বললাম নিচে গিয়ে সিএনজি রেডি করে রাখতে। আমি বেডে আর নিচে সিএনজি রেডি।

ব্লাড দিয়ে দ্রুত রওনা দিলাম এবং ঠিক ট্রেন ছাড়ার ৫ মিনিট আগেই পৌঁছে গেলাম।

যতবার রক্ত দিয়েছি অনেক স্মৃতি ভুলে গেছি কিন্তু এই স্মৃতি কখনোই ভুলবো না। সবাই দোয়া করবেন এভাবে যেন মানুষের সেবা করে যেতে পারি।

রক্তদাতাঃ Rifat Hossain অভিজ্ঞতাঃ ২৫ (সূচিপত্র)

রক্ত দেখলেই আমি ভড়কে যেতাম, যেকোন রক্ত। কাটাছিড়ার আশেপাশেও তাকাতে পারতাম না। আর হাসপাতাল? সে তো আমার কাছে এক মৃত্যুপুরী! বাবার অপারেশন হয়েছিল ২০০৪ সালে। নোয়াখালী সদর হাসপাতালে। দৈনিক খাবার নিয়ে যেতাম বাড়ি থেকে। খাবারটা কোনো মতে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েই আবার দিতাম ছুট। মা একদিন রিকুয়েস্ট করলেন আজকের দিনটা অন্তত তোর বাবার পাশে থাক। কিন্তু বাবা আমার মুখ ভঙ্গিমা দেখে মাকে বারণ করে দিলেন। বাবা সাথে সাথেই মাকে বলে দিল, ও হাসপাতাল আসলেই মনমরা হয়ে যায়, ওকে অনুরোধ করোনা। হাসপাতালের অসহায় মানুষ গুলা দেখলে আমার অনেক কষ্ট হয়। বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালে অবস্থানরত ভুক্তভোগী মানুষগুলো। আমি মনে মনে ওদের অনেক দোয়া করতাম মহান আল্লাহ্‌র কাছে।

২০০৮ সালের পর যখন ঢাকায় এ্যাডমিশন নিলাম তখন পরিবারের ও এলাকার অনেকের প্রয়োজনেই আমাকে এদিক ওদিক দৌঁড়াতে হত। বিশেষ করে হাসপাতালে বেশি দৌঁড় ঝাপ করতে হত। ২০০৯ সালের কথা। ঢাকা মেডিকেল গিয়েছিলাম এক ভাইকে নিয়ে। হঠাৎ একজনকে ফোনে উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে দেখলাম। অনেকটা রাগান্বিত ভঙ্গীতে! কাছে গিয়ে শোনার চেষ্টা করলাম। কাকে যেন রক্ত লাগবে বলে ইংগিত দিচ্ছে এপাশ থেকে। খুব জরুরী তাকে হসপিটালে আসতে বলছে। সাথের এক ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম ঘটনাটা কি? বিস্তারিত শুনতে পারলাম, এক বৃদ্ধ এক্সিডেন্ট করেছে। প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে। ইমার্জেন্সিতে আছে। হিমোগ্লোবিন অনেক কমে গেছে। আর্জেন্ট রক্ত লাগবে। অনেক রাত হয়ে গেছে তাই কেউ রক্ত দিতে আসছে না।

দৌঁড়ে গেলাম ইমার্জেন্সিতে। দেখলাম অবস্থা বেগতিক। মাথা ফেটে গেছে। অজ্ঞান হয়ে আছে। হাতে, পায়ে, পেটে অনেক জখমও হয়েছে। যে লোকটা হাসপাতালে নিয়ে আসছিল সেই অনেক মানুষকে রক্তের জন্য রিকুয়েস্ট করছেন।

রাত প্রাত দেড়টা বাজে। ফোন দিতে দিতে উনার মোবাইলের ব্যালেন্স প্রায় শেষ। আমি হাতের ফোনটা এগিয়ে দিলাম। বললাম, ভাই, ম্যানেজ হইছে? তিনি উত্তর দিলেন, না! এখনো ম্যানেজ হয় নাই! বলেন তো ভাই এখন কি করি? এতো রাতে আমি কোথায় যাই রক্তের জন্য? পাশের ব্লাড ব্যাংক গুলোও বন্ধ। আর উনাকে ফেলেও যেতে পারছি না। রোগীর আত্নীয় স্বজন কারো নাম্বার নাই আমার কাছে। আমার সাথেও ব্লাডের মিল নাই! কি যে করি..?
ব্লাডের গ্রুপ জিজ্ঞেস করাতে উত্তর দিলেন, ও পজেটিভ। শুনেই ভয়ে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। কারন আমার নিজেরও একই গ্রুপের রক্ত। জন্ডিস হইছে যখন তখন টেস্ট করিয়েছিলাম। ভয়ে উনাকে বলতে পারছি না। কিন্তু এখন কি করবো? চোখের সামনেই একজন বয়স্ক বাবাকে মরতে দিতেও পারি না। রক্ত দেখলেই আমি ভয় পাই খুব। আর নিজের রক্ত দিবো সেটা তো প্রশ্নই উঠে না! আমি পড়ে গেছি উভয়সঙ্কটে!

ঢাকাতে তখনও আমার পরিচিত তেমন বন্ধুবান্ধব হয়নি। দু-একজন যাও আছে তারা রেগুলার রক্তদান করে কিনা সেটাও নিশ্চিত না।

ইমার্জেন্সি থেকে বারবার বলা হচ্ছে দ্রুত ব্লাড ম্যানেজ করার জন্য। উনারা স্যালাইন পুশ করে রাখছেন আর প্রাথমিক চিকিৎসা যা দেয়ার তা দিয়ে রেখেছে। আমি মনে মনে আল্লাহ্‌কে স্মরন করছি আর কি করবো তা ভাবছি। রক্ত কি দিবো, নাকি দিবো না? দিলে যদি আমি অসুস্থ হয়ে যাই? উল্লেখ্য, তখন আমার স্বাস্থ্যগত দিকও তত ভালো ছিল না। ছিমছাম গড়নের ছিলাম। ৫০ কি ৫২ কেজি হব ওজনে!

আমি স্থির গতিতে চিন্তা করতে লাগলাম, আমার কি করা উচিৎ! বৃদ্ধর দিকে তাকিয়ে বড্ড মায়া লেগে গেল। মনস্থির করে ফেললাম আমিই রক্ত দিবো। কিন্তু ভয়ে আমার হাত পা সব অবশ হয়ে যাচ্ছে। তবুও নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছি এই বলে যে একজন মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচানো আমার কর্তব্য। ডিউটি ডাক্তার যখন আমায় সিটে শুতে বলেছিলেন, আমি তখন ঠান্ডা বরফ হয়ে আছি! কিন্তু যখন সুঁচ ফোঁটাতে গেলেন আমি দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুঝে রইলাম। সূঁচ ফোটানোর পর আমার মনে আছে ভয়ে আমার ঘুম এসে পড়েছিল। কর্মরত নার্স সম্ভবত আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। ব্লাড ডোনেট শেষে তারা আমাকে জোরে জোরে ডেকে তুলছেন। আমি উঠে অবাক হয়ে উঠে দেখি রক্ত দেয়া শেষ হয়ে গেছে। বেডের পাশেই ব্যাগ ভর্তি রক্ত রাখা। এতো কম সময় লাগে রক্তদান করতে - এটা আমার জানা ছিল না। একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। পানি খেয়ে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে আমি আনুমানিক চারটার দিকে বাসায় চলে এলাম।

আলহামদুলিল্লাহ্‌, ২০১৪ সাল থেকে আমরা কতিপয় বন্ধু মিলে একটা ব্লাড ডোনেট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করি। এবং প্রতিনিয়ত এখান থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অসহায় মানুষদের রক্তদাতা খুঁজে দিয়ে থাকি। এখন পর্যন্ত ৫ বার নিজে ব্লাড দিয়েছি এবং মাসে অন্তত ১০ থেকে ১৫ জন রোগীকে রক্তদাতা খুঁজে দিতে সহায়তা করে যাচ্ছি।

রক্তদাতাঃ মাহমুদুল হাসান রিয়াদ অভিজ্ঞতাঃ ২৬ (সূচিপত্র)

রিয়াদ নামের ছেলেটির হোম টাউন নারায়নগঞ্জ। পড়াশোনার জন্য ৫ বছর যাবৎ ঢাকা-নারায়নগঞ্জ দুই জায়গাতেই থাকতে হয়। ১৮ বছরের আগে নাকি রক্ত দেওয়া যায় না কিন্তু ছেলেটা তার ১৭ বছরের শুরুতেই রক্তদান করে ফেলে। করতেই তো হবে একজন গর্ভবতী মায়ের জীবনের থেকে তো সামান্য একটু শরীর খারাপ তো কিছুই না। ২য়, ৩য়, ৪র্থ বারও গর্ভবতী রোগীকেই দিয়েছিল। ৫ম বার ছেলেটা পরে যায় দোটানায়। রোগীর প্লাটিলেটের জন্য রক্ত দিতে হবে কিন্তু সেদিনই তার মিড ফাইনাল এক্সাম পরে।কি আর করার মানুষ জন্মের পর থেকেই তো পরীক্ষা দিয়ে আসছে এবার নাহয় নাই দিল।৫ম বার ডোনেট করার দেড় মাস পর ছেলেটা পরে আরেক ঝামেলায়। তার নিজের খালার দুইটা অপারেশনের জন্য তারই গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন। কিন্তু কোথাও সে রক্তদাতা খুঁজে পাচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে ৪৫ দিনের মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে নিজেই আবার রক্ত দিবে। কি আর হবে, মরে তো আর যাবে না! তারপর হয়ত আল্লাহর রহমতে অপারেশনের ডেট বেশ কিছুদিন পিছিয়ে যায়।

এইতো কিছুদিন আগে ৬ষ্ঠ বারের জন্য নারায়নগঞ্জ থেকে মিরপুরে যাবে সে। কিন্তু সেদিন শহরে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ঢাকার পুরো রাস্তাটাই হেঁটে যেতে হয়েছিল। পর্যাপ্ত ভাড়াও ছিল না যে রিকশাতে যাবে। কিন্তু সেদিন সে হতাশ হয়েছিল কারন তার রক্ত দিতে হয় নি। যাই হোক কয়েকদিন আগে সে কুমিল্লা বেড়াতে যায়। হঠাৎ রাতে সে তার ফেইসবুকে দেখে রক্তদানের জন্য তাকে কেউ মেনশন করেছে। রোগীর জন্য রক্ত পাওয়া যাচ্ছিল না। অতঃপর রাতেই সে কুমিল্লা থেকে রওনা দিয়ে দিল কিন্তু এত রাতে বাস না পেয়ে ভোরেই রওনা দিয়ে ঢাকা মেডিক্যালে চলে আসে ও ৬ষ্ঠ বারের মত রক্তদান করে।

৪৫০ মিলি রক্ত দান,
হাসবে একটি নতুন প্রাণ।

দিনটি ছিল ২০১৩ সালের মার্চের ৩ তারিখ। রাত ১১ টার দিকে একজন আপু ফোন দিয়ে বললো, হ্যালো আপনি কী মমিনুল ইসলাম?
আমি বললাম, হ্যাঁ আমি মোমিনুল ইসলাম,
আপুঃ আপনার ব্লাড গ্রুপ B+ তাই না?
আমিঃ হ্যাঁ, আমার রক্তের গ্রুপ B+, আমি টঙ্গিতে থাকি।
আপুঃ বললো, ভাই টঙ্গিতে এক মায়ের জন্য এক ব্যাগ B+ রক্ত দরকার, আপনার রক্তের গ্রুপ তো B+। আপনি কি রক্ত দিতে পারবেন?

আমি প্রথমে না বলে দিলাম। আমার ভয় করছিল কারন আগে কখনো রক্ত দান করিনি। যদি রক্ত দিলে আমার ক্ষতি হয়? তারপর সব ভয় দূর করে আপুকে ফোন দিলাম। আমি বললাম, আপু আমি রক্ত দিব। আপু আমাকে রোগীর ভাই এর নাম্বার দিল।

৪ তারিখ সকালে রক্ত লাগবো আর ৪ তারিখ বেলা ১২ টায় একাউন্টিং পরীক্ষা। আমার সারা রাত ঘুম হয়নি, আমি খুব চিন্তা করছিলাম যদি রক্তদান করলে আমার কিছু হয়! তাহলে তো পরীক্ষাই দিতে পারবো না। সে রাতে আর ঘুম হয়নি আমার। খুব চিন্তায় ছিলাম।

৪ তারিখ সকাল ৬ টায় ঘুম থেকে উঠে গেলাম। পরীক্ষার এডমিট কার্ড এবং পকেটে স্যার এর বেতন হিসাবে ১৫০০ টাকা ছিল। আমি সকালে নাস্তা করে হাসপাতালে চলে গেলাম রক্ত দিতে। রোগীটার থ্যালাসেমিয়া রোগ ছিল। আর্থিক দিক দিয়েও গরিব। ক্রস ম্যাচিং এর টাকাও তাদের কাছে নেই। ক্রস ম্যাচিং করতে ১২০০ টাকা লাগবে, আমার পকেটে স্যারের বেতন হিসেবে ১৫০০ টাকা ছিল। কোনো কিছু চিন্তা না করেই নিজের টাকা দিয়েই ক্রস ম্যাচিং করলাম।

এক ঘন্টা ক্রস ম্যাচিং এর জন্য সময় নিয়েছে। ১ ঘন্টা পর এবার রক্তদানের পালা। যে সুঁই দিয়ে রক্ত নিবে সেটা দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি সুঁই অনেক ভয় পাই। যখন রক্ত কালেকশন রুমে ঢুকে বেডে শুয়ে পড়লাম, তখন রোগীর অসহায় চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। যখন রক্ত নেওয়ার জন্য সুঁইটা আমার হাতে ঢুকানো হল তখন সামান্য একটু ব্যাথ্যা পেয়েছিলাম। সুঁয়ের নল দিয়ে আমার রক্ত ব্যাগে ডুকছে। আহহ দেখতেই ভালো লাগছে! মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে হল। মাত্র ৫ মিনিট লেগেছে রক্ত দিতে। ৫৫ মিনিট পর রোগীর কাছে গিয়ে দেখলাম আমার দান করা রক্ত রোগীকে দেয়া হচ্ছে। মনটা খুশীতে ভরে গেল।

প্রথমে মনে করেছিলাম রক্ত দিলে শরীর দুর্বল হয়ে যায়, শরীরের ক্ষতি হয় - ভুল ধারনা ছিল। যখন রক্ত দিলাম, তখন সব ভুল ধরনা চলে গেল। রক্ত দিয়ে চলে গেলাম পরীক্ষার হলে। কোন সমস্যাই হয়নি। সেই থেকেই শুরু করলাম রক্তদান করা।

শুধু নিজে রক্তদান করেই ক্ষ্যান্ত হইনি। মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্তদাতা খুঁজেও দিয়েছি। নিজের ভাই, বন্ধু, আত্মীয় সবাইকে দিয়েই রক্তদান করিয়েছি।

আশা আছে রক্তদানে ১০০ পূরন করবো।

রক্তদাতাঃ Mahfuz Mahtab অভিজ্ঞতাঃ ২৮ (সূচিপত্র)

আজ ১৮ই জানুয়ারি, আমার জন্মদিন। অনেক দিনের একটা ইচ্ছা ছিল যে জন্মদিনে রক্ত দিব। অনেকদিন ধরেই এক বড় ভাইকে জানিয়ে রেখেছি যেন ১৮ই জানুয়ারি আমাকে রক্তদানের ব্যবস্থা করে দেন এবং সেই সাথে আমার ইচ্ছাপূরণ করেন।

১৮ তারিখ দুপুরে কল আসে। লিউকেমিয়াতে আক্রান্ত এক বাচ্চার রক্তের প্রয়োজন।সাথে সাথে রওনা হয়ে গেলাম।

হাসপাতালে যেতেই রোগীর মামা ফুলের তোড়া নিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন যা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। এটাই ছিল আমার জন্মদিনের সবচেয়ে বেষ্ট উপহার।

বাচ্চাটির জন্য পুরো এক ব্যাগ (৪৫০ মিলিলিটার) রক্তের প্রয়োজন পরেনি। দরকার পরেছিল মাত্র ১৬০ মিলিলিটার। রক্তদান করে বাসায় ফিরে এলাম। আরও ভাল লাগলো যখন রোগীর মামা আমাকে আবার ফোন করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন।

রক্তদানের এই অভিজ্ঞতা কখনো ভুলতে পারবো না।

হ্যাপি ব্লাড ডোনেটিং
রক্ত দিন, জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ মাহদী হাসান খান চিশতী অভিজ্ঞতাঃ ২৯ (সূচিপত্র)

৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

জীবনের স্মরণীয় একটা দিন। সামনে এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিব। অতি দুঃখের সাথে বলতে হয় আমি আমার কলেজ জীবনে পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি। যাই হোক, কেন পাস করতে পারি নাই তার ব্যাখ্যা না হয় নাই দেই। টেস্ট পরীক্ষার পর অভিভাবক ডাকলেন ক্লাস টিচার। বড় বোনকে নিয়ে গেলাম। বোনকে অনেক কিছু বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে যাওয়া। ক্লাস টিচার কি কি বলেছিল তা আমাকে আপু না বললেও এতটুকু বুঝতে পেরেছি যে, আমি আর ৮-১০টা ছেলের মত কলেজে ক্লাস করি না। কলেজে যাই ঠিকই কিন্তু ক্লাসে আর যাওয়া হয় না। ক্লাস টিচার আপুকে কিছু শর্ত দিয়েছিল। তার প্রথম শর্ত, আমাকে তাঁর প্রাইভেটে যেতে হবে। আপুও হ্যাঁ বলে দিল। কি আর করা সেই সকাল ৬.৩০ টায় প্রাইভেটে যেতাম জিগাতলার ভোজন একাডেমীর গলিতে। প্রথম দিন দেখে অনেকেই অবাক। যাই হোক চলছিল ভালোই।

এইদিন, ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ যখন প্রাইভেটে যাই, সেদিন স্যার কে একটু বিষন্ন লাগছিল যেটা আগে কখনো দেখিনি। এক সময় স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কার রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ? আমি এবং আরেকজন ছিল।
স্যার - আগে কখনো রক্ত দিয়েছ?
আমি- জ্বী স্যার দিয়েছি।
স্যার- কতদিন আগে দিয়েছ?
আমি- ৪-৫ মাসে আগে দিয়েছি।
স্যার- আজকে সকালে নাস্তা করে এসেছ?
আমি- জি স্যার
স্যার তখন কাছে এসে বলল, তুমি কি আজকে রক্ত দিতে পারবা?
আমি বললাম - অবশ্যই স্যার।
স্যার– ভয় করবে না তো তোমার?
আমি বলি, না স্যার করবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় যেতে হবে? উত্তরে জানালেন, ঢাকা মেডিকেলে। তখন স্যার আমাকে ব্যাগ গুছিয়ে চলে যেতে বললেন। স্যার তার আত্মীয়কে ফোন দিয়ে আমার নাম্বার দিয়ে দিলেন এবং ওয়ার্ড নাম্বার টা জেনে আমাকে জানালেন। যাওয়ার পর স্যার এর আত্নীয় র সাথে কথা বলে এটুকু বুঝলাম, রক্ত লাগবে ৫ব্যাগ কিন্তু যোগার হয়নি ১ ব্যাগও। পরে আমি রক্ত দিতে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর স্যার আসলেন।
আমি বললাম, ২ ব্যাগ দিতে পারবো?
স্যার মানা করে দিলেন।

রক্ত দেয়া হল। দেয়ার পর শরীর কিছুটা খারাপ লাগছে কিন্তু যখন মনে হল ৫ ব্যাগের মধ্যে মাত্র ১ব্যাগ ম্যানেজ হয়েছে, তখন সব চিন্তা বাদ হয়ে গেল।
২০মিনিট শুয়ে থাকার পর উঠে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম। স্যার আমাকে বললেন, আগামী ২-৩ দিন প্রাইভেটে আসতে হবে না, রেস্ট নাও। মনে মনে খুশি হলাম।

এখনও স্যারের সাথে কথা হয়। স্যারকে ফোন দেওয়ার সাথে সাথেই বলে উঠে- চিশতী কেমন আছ? নাম ধরে যখন ডাক দেয় তখন এতটা ভাল লাগে যা বলে বুঝানো যাবে না আর আমার পক্ষেও সম্ভব না।

সর্বশেষ একটা কথাই বলি, রক্তদান করুন, রক্তদানে অন্যকে উৎসাহিত করুন।
"একের রক্ত অন্যের জীবন
রক্তই হোক আত্মার বাঁধন"

রক্তদাতাঃ Emtiaz Ahmed Emu অভিজ্ঞতাঃ ৩০ (সূচিপত্র)

ভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ারের কথা, বাঁধন থেকে ফোন দিয়েছিল ঢাকা মেডিকেলে রক্ত দেয়ার জন্য। এক্সিডেন্টে আহত এক লোকের জন্য রক্ত দিতে গিয়েছি। রক্ত নেয়ার আগে দেখা হল রোগীর ছেলের সাথে।

রক্ত দান শেষে রোগী দেখতে গেলাম। রোগীর সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। রোগীর ছেলে যখন আমার পরিচয় দিলেন যে আমি রক্ত দিয়েছি, তখন মহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন চিৎকার শুরু করলেন যেন তার মেলায় হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে পেয়েছেন। আমার জন্য এত্ত দোয়া করলেন যে, আমি এখনো কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে মনে হয় যেন সেই মহিলার দোয়ার কারণেই উদ্ধার হলাম।

রক্তদাতাঃ Salina Akter অভিজ্ঞতাঃ ৩১ (সূচিপত্র)

অনেকেই বলে থাকে প্রথম ভাল লাগা, প্রথম প্রেম যাই বলুন না কেন, প্রথম বারের সাথে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। কিন্তু রক্তদানের সাথে উপরের কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। কারন প্রতিবার রক্তদানই যে রক্তদাতার কাছে প্রথম মনে হয়। প্রতিবারের অনুভূতিই যেনো অসাধারণের চাইতেও বেশি অসাধারণ। তবে আমি গননার দিক থেকে হিসেব করলে প্রথমবারের অনুভূতিই ব্যক্ত করার চেষ্টা করবো। স্বপ্নের শুরুটা বিটিভির ইত্যাদি দেখে। সেখানে একজন টগবগে এক তরুণ এসেছিলেন যিনি রক্তদান করেন সেই সাথে রক্তের জন্য কাজও করেন। আমি তখন চৌদ্দ বছরের এক কিশোরী। সেই থেকে আমারো ইচ্ছে আমিও প্রতি চার মাস অন্তর অন্তর রক্ত দান করবো আর তার মতো ভলান্টিয়ারিং করবো। এরপর অনেক দিন কেটে গেছে আঠারোও পেরিয়ে গেছে। আমি চাতক পাখির মতোন অপেক্ষায় থেকেছি। বিদেশে থাকার দরুন একটু দেরী হয়েছে, সময়ের সাথে সাথে কষ্টও বেড়েছে বটে কিন্তু স্বপ্নকে ছোঁয়ার পর সেই কষ্টটা এক নিমিষে ভুলে গিয়েছি আমি। সারাদিন টাইমলাইনে রক্তের পোষ্ট ঘোরাঘুরি করতাম আর আমিও ছটফট করতাম কবে রক্ত দিতে পারবো। তাই দেশে গিয়েই ফেবুতে পোষ্ট করি রোগী খুঁজে দেওয়ার জন্য। এক বড় ভাই একটি রক্তের পোষ্টে আমাকে মেনশন করলেন। অবশেষে ২রা অগাস্ট আসে বহুল প্রতীক্ষিত সেই দিন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে গিয়ে রক্তদান করে আসি। রোগী ছিল বছর দশেকের একটা বাচ্চা ছেলে। কারেন্টে শক লেগে হাত পুড়ে গিয়েছিল। শুনেছি হাতটা নাকি কেটে ফেলতে হবে। আমি খুব একটা কাঁদতে পারি না, রক্ত দেখলে মাথাও ঘোরে না। তবে সেদিন আমি নিজের চোখের জল আটকে রাখতে পারি নি। চেহারাও ভালো করে দেখতে পারিনি, বাচ্চাটার হাতের অবস্থা দেখেই দৌড়ে চলে এসেছিলাম। তবু শান্তি নেই, আশেপাশে সবার অবস্থাই ছিলো করুণ। আমার মতে প্রতিটা মানুষের সপ্তাহে অন্তত একবার হাসপাতালে যাওয়া উচিত, বিশেষ করে বার্ন ইউনিটে। আমরা কতোটা সুখে আছি তা বোঝার জন্য এর থেকে ভাল উপায় বোধহয় আর নেই।

তো আমি পৌঁছলাম দেড়টার দিকে। শাওন আসতে আসতে দুইটা। রোগী শাওনই যোগাড় করে দিয়েছিলো। এরপর বহু প্রতিক্ষার পর ডাক্তার রক্ত তো নিতে আসলেন কিন্তু দুপুরে কিছু খাইনি বলে আবার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। আবার অপেক্ষা। এরপর খেয়ে দেয়ে রক্ত দিতে আসলাম এবার আবার ভেইন খুঁজে পায় না। ৫৩ কেজি ওজন বানানোর পরেও নাকি ভেইন খুঁজে পায় না! এরপর অন্য হাত থেকে নিলো। ব্যাগ ভর্তি নিজের শরীরের রক্ত দেখে, ছুঁয়ে হৃদয়ে গভীরে কেমন যেনো এক শীতল পরশ অনুভব করলাম যার সন্ধান আমি আগে কখনো পাই নি। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া পথিকের ঠান্ডা পানি যেমন প্রশান্তি দেয় রক্তদানও আমায় তেমনি প্রশান্তি দিয়েছিল। সত্যি বলতে এ এমন এক অনুভূতি যা প্রকাশ করার মতো শব্দ শুধু বাংলা ভাষায় কেনো পৃথিবীর কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না তার জন্য বাস্তব

অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। রক্তদানের পর কিছুক্ষন শুয়ে বিশ্রাম নিতে হয়। আমি সেটা জানতাম কিন্তু মানি নি। সাথে সাথেই উঠে গিয়েছিলাম। তাই মাথাটা একটু ঘুরছিলো। তবে সেদিনের অসুস্থতা তো আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ভুলে গিয়েছি কিন্তু রক্তদানের সে অনভূতি আজো আমার মনে ঠিক সেভাবেই দাগ কেটে আছে। এরপর বাসায় এসে দুই দিন আম্মুর ঝাড়ি সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আম্মু খুব ভালো করে জানে তার মেয়েকে যতই ঝাড়ুক সে যাবেই।

ওইদিন শুধু আমি একা নই আমার ভালবাসার মানুষটা, শাওন আর তার এক বন্ধুও রক্তদান করেছিলো। তবে খুব খারাপ লেগেছিল আমার এক বান্ধবী তোড়ার জন্য। ও ও দিতে চেয়েছিলো সেদিন কিন্তু ডাক্তার খুব কঠিন একটা কথা বলে দিয়েছে ওকে। যক্ষা হলে নাকি জীবনে কখনো রক্তদান করা যায় না। সুস্থ হয়ে গেলেও না। এ নিয়ে ভীষণ মন খারাপ ছিলো মেয়েটার। কি অদ্ভুদ তাই না? কারো সামর্থ্য থাকে, নিজের শরীরেই রক্ত নষ্ট হয়ে যায় তবু রক্ত দেয় না। কারো হাহাকার তার কান ওব্দি পৌঁছায় না, আবার কেউ রক্ত দিতে পারে না বলে মন খারাপ করে, কষ্ট পায়। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমায় সামর্থ্য আর যোগ্যতা দুটোই দেয়েছেন। তবে বাইরে থাকার দরুন খুব একটা সুযোগ হয়ে ওঠে না। সুযোগ পেলে অবশ্যই জাতি, ধর্ম, বর্ন চিন্তা না করে শুয়ে পড়বো রক্তদানের জন্য। কারন মানবতার কোনো ধর্ম বা সীমারেখা হয় না। মানবতার কেবল একটাই ধর্ম, একটাই বর্ন, একটাই গোত্র আর একটাই সীমারেখা যার নাম স্বদিচ্ছা।

রক্তদাতাঃ Md Younus অভিজ্ঞতাঃ ৩২ (সূচিপত্র)

আমার ৩য় রক্তদানের আগের দিন রাতে আমি পড়তেছিলাম, তখন রাত ১২ টায় আমার কাছে এক জন মহিলা কল করে। তার ছেলের নাকি ব্লাড ক্যান্সার ব্লাড লাগবে। বিস্তারিত জানার পর আমি বলি যে পরের দিন আমি ব্লাড দিব দুইটার পরে। যেহেতু ঐ দিন আমার অনার্স ২য় বর্ষের পরিক্ষা ছিল তারপরেও মহিলাটার কথা শুনে আমার যেন কেন মায়া হলো পরিক্ষা চলাকালীন রাত জেগে পড়তে হয়। তারপরেও ব্লাড দিতে রাজী হয়ে গেলাম। পরের দিন সকাল ৭টায় ঘর থেকে বের হলাম মাত্র এক কাপ চা খেয়ে। পরীক্ষা শেষে দুপুর ১টার সময় ঐ মহিলার নাম্বারে কল দিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমি হাসপাতালে আসছি। হালাকা নাস্তা করে হাসপাতালে গেলাম। সাথে কাউকে নিলাম না ইচ্ছা করে, যদি বাসার কেউ শুনতে পারে পরিক্ষা চলাকালীন ব্লাড দিয়েছি তাহলে অনেক ঝামেলা হতে পারে। পরে ছেলেটাকে ব্লাড দিলাম। দেওয়ার পর দেখি আন্টিটা আমার জন্য জুস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে রিকুয়েস্ট করেন জুস আর নাস্তা করার জন্য কিন্তু আমি কিছুই খাইনি। শুধু আমার জন্য দোয়া করার জন্য বলে চলে আসি। পরে আন্টিটা আমাকে ফোন করে ১ ঘন্টা পরে বাড়ীতে ঠিক মত পৌঁছেছি কিনা খোঁজ নিলেন। এখনো আমাকে প্রায় সময় কল করে। আমার কাছে এই দিনটা স্বরণীয় হয়ে থাকার কারণ পরিক্ষা চলাকালীন ব্লাড দিলাম, তারপরও মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি। শুধু মন কাজ করছে মানবতার।

রক্তদাতাঃ Sabbir Shovon অভিজ্ঞতাঃ ৩৩ (সূচিপত্র)

তারিখ ১২/০২/১৭। ক্লাস সকাল ৮টায় থাকায় সেদিন একটু দেরি হয়ে গেল ক্লাসে উপস্থিত হতে। এসে জানলাম ম্যাডামের এক আত্মীয়ের জন্য বি পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন। আমার রক্তের গ্রুপের সাথে মিলে গেল। কোথায় রক্ত দেওয়া লাগবে শোনার পর আমি স্থানটা চিনি না বলে ম্যাডামকে জানালাম। এক বন্ধুর বাসা সেখানে হওয়ায় সে আমার সাথে যেতে চাইল।

যশোর সদরে থাকি আমি, রক্ত দিতে হবে কেশবপুর উপজেলা। ক্লাস ছুটি নিয়ে মেসে এসে গোসল করে বের হলাম কেশবপুরের উদ্দেশ্যে। প্রায় তিন ঘন্টা পর পৌঁছালাম রোগীর ক্লিনিকে। রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। আজ থেকে ২২ দিন আগে তিনি সন্তান প্রসব করেছেন, কিন্তু এখনো রক্ত শরীরে নেই বললেই চলে। সাদা ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছেন তিনি। সম্পর্কে তিনি ম্যাডামের কাজিন।

রোগীর আম্মা আমাকে দেখেই কেঁদে দিলেন। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাড়াতাড়ি রক্ত নেবার জন্য বললাম। রক্তদান শেষে বসে সবার সাথে কথা বলার সময় একটা অন্য রকম অনুভব পেলাম। সবাই আমাকে এমন ভাবে দেখছে আর আমাকে আদর দিচ্ছে যে আমার নিজেরই নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার জীবনের সব থেকে পূণ্যের কাজ হয়ত এটিই করেছি আমি, সবার থেকে অনেক ভালোবাসা পেলাম আমি। রক্ত দেবার পর বন্ধুর বাসায় গেলাম। সেখানেও সবাই আমাকে খুবই আদর যত্ন করল। আর বন্ধু ও তার পরিবার এতটাই আমাকে স্নেহ করল, তখন নিজের মধ্য অন্যরকম একটা ভালোলাগা কাজ করছিল। দুপুরটা বন্ধুর বাসায় কাটানোর পর বিকালে আবার বাসে করে ফিরে এলাম মেসে।

আমার উপর এমন কোনো প্রভাব পড়েনি রক্ত দেবার পর। রক্ত দেবার জন্য দরকার শুধু প্রবল একটা ইচ্ছা। পরে ম্যাডামের থেকে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি রোগী এখন সুস্থ আছেন। ৬ বারের রক্ত দেবার মধ্যে এটাই অনেক দুরে গিয়ে দেওয়া আর নতুন কিছু পরিবারের থেকে অনেক বেশি ভালোবাসা পেয়েছি বলে এটাই এখন আমার প্রিয় রক্ত দেবার মূহুর্ত। সবাইকে এতটুকুই বলবো, রক্ত দিলে এমন কোন প্রভাব শরীরে পরে না। বিপরীতে পাওয়া যায় মানুষের থেকে ভালোবাসা। তাই রক্ত দিন, একটি জীবনকে বাঁচিয়ে তুলুন।

রক্তদাতাঃ Tahedul Bashar Farhad অভিজ্ঞতাঃ ৩৪ (সূচিপত্র)

মানবতা কি? তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি না করলে কখনো বুঝতাম না। হয়ত রক্তদানের মাধ্যমে আমার সেই সৌভাগ্যটা হয়েছে। এই পর্যন্ত ১০ বার রক্তদান করেছি। ইচ্ছা আছে ১০০ করব। আসলে রক্তদান কি সত্যিকার অর্থে একজন রোগীর আত্মীয়র দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ধন্যবাদের চেয়েও বেশি কিছুর গল্প।

প্রত্যেকটা রক্তদান আমার কাছে স্মরণীয়। তারপরেও একটা সেরা থাকে। আমার সবচেয়ে স্মরনীয় রক্তদানের অভিজ্ঞতা হল আমি যখন দ্বিতীয়বার রক্তদান করতে যাই। আগে বলে রাখি, নিজ উদ্যোগে আমি প্রথম রক্তদান করেছিলাম। কিন্তু ফেসবুকে কিছু সেচ্ছাসেবী গ্রুপে যুক্ত থাকায় নিয়মিত রক্তদানে আগ্রহী হই, যার পুরো ক্রেডিটটা দিব আদনান সিকদার ভাইকে।

আমার যখন রক্তদানের সময় হয় তখন ইমাম ভাইকে ফোন করি, তিনি আমাকে একজন রোগী ঠিক করে দেন। সময় অনুযায়ী সন্ধ্যার দিকে একজন বন্ধুকে নিয়ে চট্রগ্রাম মেডিকেলে যাই। যার ফোন পেয়ে আমি রক্তদান করতে যাই উনি ছিলেন রোগীর পাশের কেবিনে। মানবতার খাতিরে উনার ফোন থেকে ফোন দেন, কারন রোগীর আত্মীয় কারোর মোবাইল নেই।

আমি যখন মেডিকেলে যাই তখন পাশের কেবিনের একটা ছেলে রোগীর মাকে নিয়ে আসেন। নিয়ম অনুযায়ী উনার সাথে পরিচিত হয়ে রক্ত দিতে ব্লাড ব্যাংকে যাই। কিন্তু যখন ব্লাড ব্যাংকে ফি খুজল তখন রোগীর মা তার কাছে টাকা নেই বলল। না থাকারই কথা কারণ উনি ছিলেন খুবই গরীব। মেয়েকে কষ্ট করে বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কপালে সুখ নেই। তার জামাতা সবসময় মেয়ের উপর অত্যাচার করে। এমনকি মেয়ের অপারেশন হয়েছে দেখার জন্য পর্যন্ত মেডিকেলে আসে নাই। উনার কাছে যখন টাকা নেই বলল আমার কিছু করার ছিল না, কারন আমাদের কাছে যা টাকা ছিল তা পর্যাপ্ত নয়। টাকার অভাবে তাই রক্ত নেয়া হল না। তাই আমি বাসায় চলে আসি।

রক্ত দিতে না পেরে খারাপ লাগছিল। বাসায় পৌঁছাতেই আবার কল আসে ব্লাড ব্যাংকের ফি দেওয়ার জন্য টাকা যোগার হয়েছে। বন্ধুকে নিয়ে আবার রওনা হলাম। তখন রাত দশটা বাজে। মেডিকেলে পৌঁছাতেই মহিলাটি কান্না করে দিল। অনেক খারাপ লেগেছিল যা বুঝানোর মত নয়। যাক তারপর রক্ত দিলাম এবং ঐখান থেকে আবার রোগীকে দেখতে যাই। যখন রোগীর সাথে দেখা হয় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। একজন অল্প বয়স্ক মহিলা, বেড থেকে মাথাটা তুলতে পারছিল না। মনে হয় আমাকে কিছু বলতে চাইছে কিন্তু কথা বলার শক্তিটুকু নেই। শুধু তার অসহায় চোখ দিয়ে এক পলক আমাকে দেখল। আমারো কখন জানি চোখের কোনায় পানি চলে আসল বোঝতেই পারিনি। তারপর ঐখান থেকে চলে আসি এবং নিজেকে একজন মানুষ মনে হল। এত বড় আত্বতৃপ্তি আর কোন কাজ করে পাইনি। মনে হয় কখনো পাবও না। কেননা রক্তদান হল এমন একটি কাজ যা অন্য কিছুর সাথে তুলনা করা যায়না। আমি রক্তদান করে নিজেকে গর্বিত মনে করি। এই মানবতার কাজে আপনি যেমন আত্বতৃপ্তি পাবেন, তেমনি কোন মা/বাবা/ভাই/বোনের মুখে হাসি ফুটাবেন। রক্তদিন, জীবন বাঁচান।

রক্তদানের জন্য কথা হয় রোগীর রিলেটিভের সাথে। রোগী বারডেমে ভর্তি। ১৬ ডিসেম্বর পুরো দিন অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু রক্ত লাগেনি। আমি তাদের বলি আসি, যখন রক্ত লাগবে আমাকে জানাবেন। যদি সম্ভব হয় একটু সময় হাতে রেখে বলবেন আর আমার জন্য সন্ধ্যায় সিডিউল রাখলে ভাল হয়। কিন্তু পরের দিন সকাল ৬টায় বলে রক্ত দিতে হবে সকালেই। আমি তাদের বলি, আমাকে ১০ টার ভিতর ছাড়তে হবে, অফিসে যাওয়া খুব ইমারজেন্সি ছিল। হাসপাতালে গিয়ে দেখি আরও কয়েকজন রক্তদাতা এসেছেন। সেদিন রক্ত লাগল না। চলে এলাম। অন্য ডোনাররা বেশ দুর থেকে এসেছে তাই তাঁদের থেকে রক্ত নিয়ে নিতে বললাম। আর আমি স্টকে থাকলাম। যখন দরকার হবে দিবো।

পরের দিন দুপুরে আবার কল দিলেন উনারা। বললেন রক্ত দিতে হবে। অফিস ফাঁকি দিয়ে চলে এলাম হাসপাতালে। সেদিনও রক্ত লাগলো না।

এরপর যেদিন বললো সেদিন ছুটির দিন ছিল। আমাকে যখন কল দিয়েছে তখন রাত সাড়ে ১০টা। আমি মাত্র বাসায় ঢুকেছি। আমার বাসার গেট বন্ধ হয় রাত ১১টায়। আমি আমার বন্ধুকে কল দিলাম, রোগী ওর বন্ধুর রিলেটিভ। এই বন্ধুর বাসায় রাতে যেকোনো সময় যাওয়ার যায়। কিন্তু ও বলে কালকে ওর অফিস আছে। আমি বললাম অফিস তো আমারও আছে। যাইহোক, আরেক বন্ধুকে কল দিলাম। সে বলে, আমি সারাদিন ভাত খাইনি। পকেটে টাকা নেই। আমি তাকে একটা হোটেলে গিয়ে খেতে বসালাম এবং বিল দিলাম। একসাথে রওনা দিলাম রক্তদানের উদ্দেশ্যে।

রোগীকে বারডেম থেকে কোয়ান্টামে রেফার করলো। রাতে কোয়ান্টামে গেলাম। রক্ত দিয়ে যখন বের হলাম তখন রাত দেড়টা। কোয়ান্টাম থেকে রক্ত নিয়ে বারডেমে আসলাম। রাত ২টা বেজে গেল। প্রচন্ড শীত। মানুষ দুইজন, কিন্তু শীতের কাপড় একটা। শীতের কাপড়টা বন্ধুকে দিয়ে শাহাবাগ থেকে আজিমপুরের উদ্দেশ্য রওনা হলাম। রোগীর সাথে যারা ছিল তারা পৌছে দিতে চাইলো বাসায়, তাদের না করলাম। ভাগ্য খারাপ হলে যা হয় একটা রিকশা বা সিএনজিও পেলাম না। পুরোটা পথ হেটে যেতে হল।

রক্তদাতাঃ Sabit Mahmud অভিজ্ঞতাঃ ৩৬ (সূচিপত্র)

দিনটা ছিল গতবছর গ্রীষ্ম এর কোন এক দুপুর। ফেইসবুকে একটা পোষ্টে দেখলাম জরুরি ১০০ এমএল বি পজেটিভ রক্তের প্রয়োজন এক বাচ্চার জন্য। ১০০ এমএল রক্ত দেয়ার মত সময় প্রায় হয়ে গিয়েছিল। তাই যোগাযোগ করি বাচ্চার বাবার সাথে। আমি যথারীতি হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত। গিয়ে দেখি ব্লাড রিকুইজিশন পেপারে ১০০এমএল বিপজেটিভ প্লাটিলেট প্রয়োজন। আমার দুর্ভাগ্য আমি প্লাটিলেট দেয়ার মত যথেষ্ট ওজনধারী নই। তো এখন কি করি কিছুই মাথায় আসছিল না। এর উপরে ওই বাচ্চার রক্ত খুব তাড়াতাড়ি দেয়ার প্রয়োজন ছিল। আর যে হাসপাতালে গিয়েছিলাম ওখানে প্লাটিলেট নেয়ার মত কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই বাচ্চার বাবাকে নিয়ে রওনা দিলাম মগবাজার কোয়ান্টাম এর উদ্দেশ্যে। পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেজে গেল সন্ধ্যা ৬টা।

ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম ওদের কাছে প্লাটিলেট ব্লাড আছে কিন্তু ওরা আর একটি ব্যাগ ব্লাড না নিয়ে ওদের কাছে থাকা প্লাটিলেটটা দিবে না। অনেক অনুরোধ করেও কোনো কিছু করতে পারিনি। আমি তখনও রোগীর লোককে বলিনি যে আমি দেড় মাস আগেই ব্লাড ডোনেট করেছি। ব্লাড না পেয়ে ওই লোকের কান্না দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম নিজেই এক ব্যাগ রক্ত দিয়ে দিব এই ৩ দিনের বাচ্চাটাকে বাঁচাতে। তো সারাদিন কিছু না খাওয়াতে আমার প্রেসার ফল করে যায়। ডাক্তার আমাকে বলেন আপনি কিছু খেয়ে আসেন, আপনার প্রেসারটা বাড়লেই আপনার রক্ত নিব। আমি নিজেও একটু মিথ্যা বলেছিলাম যে আমি ৪ মাস আগেই ব্লাড ডোনেট করেছি।

সামান্য কিছু খাওয়া দাওয়া করে আবার যখন ডাক্তার এর কাছে গিয়ে বসি তখনও দেখি প্রেসার বাড়েনি। নিজের উপরেই রাগ হচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিলাম কি হচ্ছে এসব। জেদের বসে ডাক্তারকে বলে ফেলি আপনি আমার রক্ত নিয়ে নেন। আমার কিছু হবে না। আগে বাচ্চাটার রক্তের ব্যবস্থা করতে হবে। ডাক্তার আমাকে উল্টো ধমক দিয়ে বসে থাকার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি পারছিলাম না ওই বাবার কান্না জড়ানো চিন্তিত মুখখানি দেখতে। তাই আল্লাহ এর কাছে প্রার্থনা করতে থাকি যেন প্রেসারটা নরমাল হয়ে যায়। ৩য় বার যখন আমার সিরিয়াল আসলো তখন ও অনেক চিন্তা নিয়ে ডাক্তার এর সামনে গিয়ে বসলাম। উনি আমার প্রেসার চেক করে দেখল প্রেসার নরমাল হয়েছে। শান্তির একটা দীর্ঘশাস ফেলে বেডে গিয়ে শুলাম। রক্ত দিলাম ৪০০এমএল। এরপর কাউন্টার থেকে প্লাটিলেটের ব্যাগ কালেক্ট করতে করতে বেজে গেল ৯টা। ওই লোক আবার ঢাকা শহরের কিছুই চিনে না। তাকে বাসে তুলে দিয়ে আমি বাসায় চলে আসি। পরদিন ফোন দিয়ে জানতে পারি ব্লাড দেয়ার পর বাচ্চা অনেকটা সুস্থ। ২-৩ দিনের মধ্যে রিলিজ করে দিবে।

হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার দিন আমাকে ফোন দিয়েছিল কিন্তু ব্যস্ততার কারণে যেতে পারিনি। ওইদিন ব্লাড দিয়ে বাসায় আসার পর চিন্তা করি আজ না হয় জেনে শুনে নিজের একটু ক্ষতি করলাম কিন্তু তার জন্য তো অন্য একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবন বাঁচাতে সাহায্য করতে পারলাম। অনুভুতিটা সত্যি অসাধারণ ছিল।

রক্ত দিন জীবন বাঁচান

রক্তদাতাঃ SB Prio অভিজ্ঞতাঃ ৩৭ (সূচিপত্র)

গত ২৮-৯-২০১৫ ইং। আমার কাছে কল আসে চিটাগাং মেডিকেলে ২ ব্যাগ ব্লাড লাগবে। তারা একজন ডোনার পেয়েছে। আরেকজন কোন ভাবে ব্যবস্থা করতে পারছে না। তখন বাজে রাত ১২টা, সকালে অপারেশন। আমি থাকি ফেনীতে। আমি কিছুক্ষণ ফোনে চট্টগ্রামের কিছু রক্তদাতাদের রাজি করানোর চেষ্টা করি। কিন্তু ডোনার পাচ্ছিলাম না। ব্লাড ছাড়া অপারেশন হবে না। আমি শেষ ডোনেট করেছিলাম ৩ মাস ২৮ দিন আগে। এর উপর আমি অনেক বিপদে দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার বোন মারা যায় অল্প কিছু দিন আগে। এখন বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান আমি।

বিবেক কেন যেন মানছিল না। ঐ লোকটাকে বাঁচাতে হবে। তখন রাত ১২টা ৩০ মিনিট। বাসা থেকে বের হতে দিবে না জানলে তাই চুরি করে বেরিয়ে পড়ি। এক কাজিন ছিল বাসায় তাকে বলি সবাইকে বলবেন আমি ভোরে একটা কাজে বাহিরে গেছি। আসতে দেরি হতে পারে। ঘর থেকে বের হতেই একটা রিক্সা মিলে যায়। তারপর বাস কাউন্টারেও যেয়ে দেখি ফেনী থেকে চট্টগ্রামের কোন বাস নেই, যা আছে সব ফেনী টু কক্সবাজার। তারপরও কিছু না ভেবে কক্সবাজারের বাসে ওঠে যাই। চট্টগ্রামের অলংকারে পৌঁছাতে প্রায় ৩টা বেজে যায়। রাত তিনটা তাও আবার অচেনা শহর। আবার সিএনজি নিয়ে অলংকার থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল রাস্তা পাকা থাকায় খুব তাড়াতাড়ি মেডিকেলে পৌছে যাই। মেডিকেলে ঢুকতেই আমার এক পরিচিত নানুর সাথে দেখা হয়ে যায়। আমাকে বলেন, তুই এখানে কেন? আমি যখন বলি রক্ত দিতে এসেছে, তিনি রেগে অবস্থা খারাপ। যাইহোক, সারারাত না ঘুমিয়ে সকালে ব্লাড দিয়ে আবার রওনা দিলাম আপন শহর ফেনীর উদ্দেশ্যে।

রক্তদাতাঃ Rasel Khan Niloy অভিজ্ঞতাঃ ৩৮ (সূচিপত্র)

"সকলের তরে, সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"। এই কথাটা খুব ছোটকাল থেকেই অন্তরে পুষতাম।বুঝ হবার পর থেকেই ভাবতাম,কখনো যদি কারো উপকার করতে পারতাম।তাহলে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করতে পারবো। তাই ছোট থেকেই সামাজিক কাজকর্মের দিকে আমার একটু বেশিই নজর থাকতো।

আমি ছোট থেকেই দেখে আসছি আমার ছোট মামা সেচ্ছায় মূমুর্ষ রোগীকে রক্তদান করছে। মামা সেনাবাহিনীতে চাকরির করে,তাই মামা ডায়োড ঠিক রাখার জন্যই উপরের স্যারদের নির্দেশেই রক্তদান করতো। প্রতিবার মামার বাসায় বেড়াতে গেলে মামার মুখ থেকে রক্তদানের গল্প শুনতাম। তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলছি আমিও বড় হয়ে মানুষকে রক্ত দিবো।

আমার এইচ.এস.সি এক্সাম চলা কালে আমি একবার গোপনে ডাক্তারের কাছে যাই। রক্তদান এর কথা বলতেই ডাক্তার আমার শরীর এবং ওজন দেখে আমাকে দুই-এক বছর পর থেকে দিতে বলে। তখন অনেকটা মন খারাপ করেই চলে আসি। তারপর আমি চাঁদপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত অবস্থায় দেখতাম ক্যাম্পাসে বড় ভাই এবং ফ্রেন্ডরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে রক্তদান করে আসে।পরে আমাদেরকে বলে এবং ফেসবুকে ছবিও আপলোড দেয়।

একদিন আমি আর বন্ধু তানভীর একটি হাসপাতালে গিয়ে নিজেদের টাকা দিয়ে রক্তের গ্রুপ নির্নয় করে আসলাম শুধুই রক্তদান করবো বলে।গ্রুপ জানার পর তো আর তড় সইছে না কবে যে রক্তদান করবো।ক্যাম্পাসের ফ্রেন্ড,ছোট ভাই,শিক্ষকসহ মোটামুটি সবাইকে আমার রক্তের গ্রুপ জানিয়ে দিলাম।

কয়েকদিন পর আমার খুব প্রিয় একজন শিক্ষক কিবরিয়া স্যার বললো, নিলয় ঢাকার পিজিতে এবি+ রক্ত লাগবে। নরসিংদী পলিটেকনিকের ইশরাত ম্যাডামের মায়ের ওপেন হার্ট সার্জারির অপারেশন। আমি স্যারকে একবাক্যে "হ্যা" বলে দিলাম।

আমি চিন্তা করলাম, কাউকে সাহায্য করার জন্য আমার বাবার তো অনেক টাকা-পয়সা নাই, তাহলে এক ব্যাগ রক্ত দিয়েই মানুষকে সাহায্য করি। তারপর দুইদিন পর টিচারের সাথে চাঁদপুর থেকে দুপুরে রওনা দিয়ে ঢাকায় সন্ধ্যায় এসে পিজিতে ১ম বারের মতো ব্লাড ডোনেট করলাম।

তখন আমি খুবই আনন্দিত এবং এক্সাইটেড ছিলাম। উপলব্ধি টা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবোনা। রাতের লঞ্চেই আবার খুশি মন নিয়ে চাঁদপুর চলে আসলাম। এবং এখন নিয়মিত রক্তদান করি। ইনশাল্লাহ আমার রক্তদানে সেঞ্চুরি করার ইচ্ছে আছে। আপনারা দোয়া করবেন, যাতে ইচ্ছেটা পূরন করতে পারি।

১ম বার রক্ত দেওয়ার পর শুধু একটা কথাই বারবার একটা আফসোস করছি, ইশ আরো আগে কেন রক্ত দেইনি!!

রক্তদাতাঃ Omar Bin Kasim Sefat অভিজ্ঞতাঃ ৩৯ (সূচিপত্র)

সময়টা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস। তারিখটা সঠিক মনে নেই। মাঝামাঝি হবে মাসের। অনেকদিন ব্লাড নিয়ে কাজ করলেও ওজন আর বয়সের কারণে আমার ব্লাড দেয়া হয়ে উঠেনি তখনো। অনেকবার হাসপাতালে গিয়ে ফিরে এসেছি ওজন আর বয়স কম হওয়ার কারণে। সবাইকে রক্ত দিতে বলি, সবাইকে রক্ত দেয়াই কিন্তু নিজে রক্ত দিতে পারিনা এটা যে কত কষ্টের ছিল আমার জন্যে বলে বুঝাতে পারবোনা। যদিও আমি সুঁই/ রক্ত এসবকে ছোট বেলা থেকেই খুব বেশি ভয় পেতাম, কিন্তু তারপরেও রক্ত দেয়ার জন্যে একটা জেদ চেপে বসে আমার মাঝে। কিন্তু এইবার আমি মোক্ষম একটা সুযোগ পেলাম। কল পেলাম যে, ছোট একটা বাচ্চার জন্যে ১০০ মিলির মত ও+ রক্ত দরকার, আর খুব দরিদ্র তার পরিবার। এমন কি ২ বেলা খাবার পাওয়ার নিশ্চয়তা তাদের ছিল না। রংপুর থেকে ফেনীতে কাজ খুঁজতে এসেছে তাদের পরিবার।

যাইহোক যখন ফেনী কনসেপ্ট হাসপাতালে রক্ত দিতে গেলাম একা (কারণ কাউকে জানিয়ে গেলে বা সাথে নিয়ে গেলে আমাকে রক্ত দিতে বাঁধা দিবে সবাই, ওজন ছিল তখন ৪৩ কেজির একটু বেশি)। এখন ক্রস ম্যাচিং করার সময় দেখলাম যে হাসপাতাল এর ওরা বাচ্চার বাবার সাথে বাজে ব্যবহার করছে।
জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়ছে?
তখন ওই অসহায় বাবা বললেন যে তার কাছে পুরা টাকাটা নেই।
এর কয়েক ঘন্টা আগে আমি আব্বুর থেকে হাত খরচের টাকা নিয়েছিলাম। যখন শুনলাম ওই লোকের কাছে টাকা নাই তখন নিজের হাত খরচের টাকা থেকে কিছু টাকা দিলাম মানুষটাকে। নিতে চাচ্ছিল না টাকা কিন্তু এত অসহায় ছিল যে না নিয়ে উপায় ছিল না।

যখন রক্ত দিতে শুয়ে গেলাম তখন ভয়ে একটু কাঁপছিলাম, কারণ সবার মুখে শুনতাম যে সুঁইটা ঢুকাবার সময় নাকি অনেক ব্যথা লাগে। এমনিতেই ভয় পাচ্ছিলাম, তার উপরে যে টেকনোলজিষ্ট ব্লাড নিচ্ছিল সে বোধ হয় কাজে অনেক কাঁচা ছিল কারণ সুঁই ঢুকাবার সময় বেশ ব্যাথা পেয়েছিলাম। যখন সুঁইটা ফোটালো (৩ বারের চেষ্টায়) তখন মন চাচ্ছিল বেড ছেড়ে উঠে পালিয়ে যাই। এত ব্যথা লাগছিল! অসহ্য সেই ব্যথায় কখন যে চোখ থেকে পানি কয়েক ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছে বলতেই পারবো না। তবে এরপরে অন্য রক্তদানে আর কখনো সুঁই ফোটানোর সময় ব্যথা অনুভব করিনি। এই রক্তদান আমার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় রক্তদান ছিল, কারণ এটাই আমার প্রথম রক্তদান, আর নিজের পকেটের টাকা দিয়ে এক অসহায় মানুষকে সহযোগিতা করতে পেরেছি - এর চেয়ে ভালো লাগার আর কি হতে পারে?
তবে রক্তদানের আগের ভয় আর সুঁই গাঁথার সময় চোখের পানি পড়লেও যখন ওই অসহায় পরিবারের মানুষদের মুখে হাসি দেখতে পাই তখন কি যে ভালো লেগেছিল আপনাদের বলে বুঝাতে পারবোনা।

রক্তদাতাঃ Emplesis Bibek Nazim অভিজ্ঞতাঃ ৪০ (সূচিপত্র)

সময়টা সকাল ১০ টা ৪০ মিনিট। শেওড়াপাড়া থেকে মহাখালী বাস থেকে নেমে হোস্টেলের উদ্দেশ্যে হাঁটছি।
ফোন এল - নাজিম ভাই, আপনি শেষ রক্ত দিয়েছেন কবে?
- চারমাস আগে।
- আপনার ওজন কত? প্লাটিলেট দিতে পারবেন?
- ৫০ কেজি, কিন্তু আমার কাছ থেকে প্লাটিলেট নিবে না।
- সমস্যা নাই; আমি হাসপাতালে কথা বলে দেখি দিতে পারবেন কিনা।
- আচ্ছা

দুই মিনিট পর আবার ফোন এল - ৫০ কেজিতে প্লাটিলেট দিতে পারবেন। আপনি এখন "বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল" এ আসতে পারবেন?
- হুম ভাই পারব (কোনো কিছু চিন্তা না করেই)

পকেটে আছে ২ টাকা, তাই হোস্টেলে এসে ১০০ টাকা ধার নিয়ে রওনা দিলাম। উনাকে আবার কল দিলাম, ভাই রোগীর ব্লাড গ্রুপ কি এ পজেটিভ? (শিউর হওয়ার জন্য)
- হুম।

যাওয়ার পথে অনেক দোয়া করলাম যাতে রিজেক্ট না হই। জীবনে প্রথম প্লাটিলেট দেওয়ার সুযোগ আসল। কোনো ভাবেই মিস করা যাবে না।

হাসপাতালে আসলাম। মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট ভাই আমার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছেন (এই ছেলের শরীর থেকে প্লাটিলেট নেওয়া যাবে?)
CBC টেষ্টের জন্য 5ml রক্ত নেওয়ার সময় বলছে, আপনার ভেইন তো অনেক চিকন; অন্য হাত দেখি। শক্ত করে মুঠি করেন।
আমি পুরো শরীরের শক্তি দিয়ে মুঠি করলাম যাতে ভেইন ভালো ভাবে দেখা যায়।
টেকনোলজিষ্ট বলে, হুম এইবার মোটা ভেইন পাওয়া গেছে।

তার মানে আমি প্লাটিলেট দিতে পারব (আমি খুশিতে আত্মহারা)। তারপর শুয়ে গেলাম প্লাটিলেট দিতে। ক্যান্সার আক্রান্ত এক ভাইকে প্লাটিলেট দিলাম। আমার তখন কি পরিমান আনন্দ লাগছে বলে বোঝাতে পারবো না। কখনো ভাবিনি আমি প্লাটিলেট দিতে পারব। প্লাটিলেট দেওয়ার মতো সৌভাগ্য আমার হবে তা কখনো কল্পনাও করি নাই।

রক্তদাতাঃ Himel Maruf অভিজ্ঞতাঃ ৪১ (সূচিপত্র)

০৭.০২.১৪ ইং তারিখ শুক্রবার আমি জীবনে প্রথমবার রক্ত দান করি । রোগীর দেশের বাড়ী দিনাজপুরে , তবে অনেক দিন ঢাকায় থাকেন । বয়স ৫০ এর মত । মগবাজারে কমিউনিটি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তিরত । উনার পায়ের একটা বড় ধরনের অপারেশন হয়েছে যার কারনে আমার আগে উনার আরো ৫ ব্যাগ রক্ত লেগেছে । আমার রক্তের গ্রুপ 'এ নেগেটিভ' । এর আগে ১০টা হতে ৪টা পর্যন্ত বসে থেকে রক্ত দিতে না পারায় মনটা খুব খারাপ হয়েছিল সেদিন । কারনটা ছিল , সব ডেলিভারী রোগীর রক্তের প্রয়োজন হয় না । যাই হোক , সেদিন থেকেই মনের ভিতরে রক্ত দানের আগ্রহটা আরো বেড়ে যায় ।

আমার প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা চলছিল, তাই শুক্রবার ছাড়া রক্তদান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না । তাই কয়েক বার যোগাযোগ করে ব্যাপারটা ফাইনাল করা হয় । শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে আমি নাস্তা করে রেডি হই । তারপর ১০ টায় কল্যাণপুর থেকে মগবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেই । আমার ধারনা ছিল জুম্মার নামাজটা বাসায় এসে পড়তে পারব । কিন্তু হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক বন্ধ থাকায় ঝামেলায় পড়তে হয় । প্যাথলোজীতে ১১:৩০ টায় ব্লাড দিয়েও সব টেস্টের রির্পোট দেয় ২ টায় । মাঝে জুম্মার নামাজটা পড়ে আসি । সত্যি বলতে কি , এই সময়টা অনেক খারাপ লাগছিল । একে তো ভয়ে ছিলাম যে রির্পোটে কি আসে , রক্ত দিতে পারবো কিনা । অবশেষে যখন জানতে পারলাম আমার রক্ত দিতে কোন সমস্যা নাই, তখন একটু স্বস্তি পেলাম ।

আমার আগের একজন যখন রক্ত দিচ্ছিল তখন একটু একটু ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু রক্ত দেওয়ার সময় তেমন কিছু মনে হয়নি । সূচ এর সামান্য ব্যাথা কিছুই না । মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার এক ব্যাগ ব্লাড দিতে ০২ মিনিট ৫২ সেকেন্ড সময় লাগে । ডাক্তার এর মতে, আমার রক্তের চাপ নাকি বেশি । আমার আগের জনের ৪ মিনিট এর বেশি সময় লেগেছে । রক্ত দেওয়া শেষ হলে কিছু সময় শুয়ে থাকি । বাসায় চলে আসার আগে রোগীর কাছে যখন বিদায় নিতে গেলাম আর উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করছিলেন সত্যিই সেটা ছিল আমার জন্য অনেক পাওয়া । কতোটা যে আত্মতৃপ্তি পাচ্ছিলাম তা লিখে প্রকাশ করার মত ভাষা আমার জানা নেই । যারা দিয়েছেন শুধু মাত্র তারাই বুঝেন । আমার মনে হয় , এই দোয়া মন থেকে পাওয়া যায় যা খুব কম কাজেই সম্ভব ।

অন্যদিকে ভাবতেই ভাল লাগছে যে, মানুষ হিসাবে অন্য মানুষের বিপদে সাহায্য করতে পেরে । তাই তো এখন আবার অপেক্ষার প্রহর গুনছি কবে আবার রক্ত দিতে পারবো আর মন থেকে তৃপ্তি পাব ।

রক্ত দিন, জীবন বাঁচান।

রক্তদাতাঃ Mohiuddin Mohim অভিজ্ঞতাঃ ৪২ (সূচিপত্র)

দিন তারিখ মনে নেই। ২০১৪ সালের কোন একটা সময়। অপরিচিত একটা নম্বর থেকে কল আসে। জানতে পারলাম একজন মুমূর্ষু রোগীর জন্য এ পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন। আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম।

পরদিন রক্তদান করতে চলে গেলাম। রক্তের ক্রস ম্যাচিং শেষে ডাক্তার জানালেন প্লাটিলেট নেয়া হবে। এতে অনেক সময় লাগবে, ধৈর্য ধরে রাখতে হবে। আমি রাজি আছি কিনা জিজ্ঞেস করলেন। রোগীর অবস্থা দেখে আর না করতে পারলাম না।

প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। দেড় ঘন্টা ধরে এফেরেসিস পদ্ধতিতে রক্ত টেনে, প্লাটিলেট পৃথক করে আবার রক্ত আমার শরীরে প্রবেশ করানো হয়। প্লাটিলেট দান সম্পন্ন্য হল। দেড় ঘন্টা শুয়ে থেকে পিঠে ব্যাথা হয়ে গেল, কিন্তু মনে আনন্দ ছিল। আল্লাহর রহমতে একটা মানুষ অন্তত পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে আমার প্লাটিলেটের কারনে। এর চেয়ে বড় সুখ আর কি হতে পারে।

রক্তদাতাঃ Md Yousuf Emtiaz Zisan অভিজ্ঞতাঃ ৪৩ (সূচিপত্র)

তখন এইচএসসি পরীক্ষা প্রায় শেষ, শুধু ব্যবহারিক পরীক্ষা বাকি। ইচ্ছা ছিল মানুষকে সহযোগিতা করা। তার মধ্যে একটি হল রক্তদান কর্মসূচী। বেশ কিছু রক্তদাতার নাম্বার সংগ্রহ করেছিলাম তখন। আমার প্রাণীবিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষার আগের দিন বন্ধু সাহেল জানালো তাদের এলাকার একজন রোগীর চার ব্যাগ করে প্রতিদিন রক্তের দরকার। একটু যেন ম্যানেজ করে দিই। ভাবছিলাম পরীক্ষা শেষ হলে নিজে রক্ত দিব। কিন্তু চিন্তায় পড়ে গেলাম চার ব্যাগ রক্ত কিভাবে ম্যানেজ করে দিব। তখন ছিল রমজান মাস। রক্ত লাগবে ইফতারের পর। মাকে বললাম। মা রাজি হচ্ছিল না। রাতের মধ্যে বাড়ি ফেরার আশ্বাস দিলাম যখন রাজি হল। আমি নিজে দিব এক ব্যাগ। রোগীর লোক ম্যানেজ করছে এক ব্যাগ। শহরে থাকা দুজন বন্ধু রাগীব ও অভিকে রাজি করালাম রক্তদান করার জন্য।

বিকাল তিনটায় গ্রাম থেকে শহরের পথে রওনা হলাম (প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পথ) । ইফতারের আগে বন্ধু রাগীবের বাসায় পৌছালাম। ইফতার করেই বন্ধু আর আমি মেডিকেলে গেলাম। ততক্ষণে বন্ধু অভি এসে হাজির। ইফতারের পর ব্লাড ব্যাংকে সব রোগীর লোক আর রক্তদাতাদের ভীড়। সেজন্য সিরিয়াল অনেক লম্বা। ইফতারের পর পর রক্ত দিয়ে বাসায় ফিরবো ভেবে আসলাম!! কিন্তু এখানে এসে দেখি তার বিপরীত। পরদিন আবার এক্সাম ও! রমজানে অতি জরুরী না হলে ইফতারের পর রক্ত দেয় সবাই। সেজন্যই ভীড়। চলে আসা ঠিক হবে না জেনে অপেক্ষা করতে থাকলাম। বন্ধু দুজনকেও বুঝিয়ে বসিয়ে রাখলাম।

শেষ পর্যন্ত রাত এগারোটায় চারজন মানুষ একত্রে রক্তদানে শুয়ে গেলাম। চার জনের চার ব্যাগ লাল রক্ত নিয়ে এক ব্যাগ সাদা রক্ত করে সেটা রোগীর শরীরে দিবে। রক্তদানের পর নিজের ভিতরের খুশিটা ভাষায় প্রকাশ করার মত ছিল না। রাত দেড়টায় বাড়ি ফিরে একত্রে সেহেরী খেয়ে ঘুমালাম। সকালে উঠে ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে গেলাম।

রক্তের রং লাল। নেই কোনো জাত বা ধর্ম। আসুন রক্ত দিই, জীবন বাঁচাই।

৬-০১-২০১৭ তারিখটা আমার কাছে স্মরনীয়।

আমার বয়স এবং ওজনের কারনে আগে কখনো রক্তদানের সুযোগ পাইনি। কিছুদিন আগে আমার ১৮ বছর পুর্ন হল, এবং পাশাপাশি ওজনও বেড়েছে। রক্তদানের অপেক্ষায় রইলাম।

আমি ৫ তারিখ সিলেট যাব। তাই সেখানের কিছু ভলান্টিয়ার ভাই-বোনদের জানিয়ে রেখেছি যেন ৬ তারিখ বি পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন হলে আমাকে সাথে সাথে জানায়। সেদিন পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শেষ হল, কিন্তু রক্তদানের জন্য এখনো কোন রোগী খুঁজে পাইনি। কল দিলাম মান্না ভাইকে। মান্না ভাই অনেক কাজ ফেলে রেখে আমার সাথে এলেন সিলেট ওসমানী মেডিকেলে। উদ্দেশ্য হল মেডিক্যালের কোনো রোগীর বি পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন হয় কিনা খোঁজ নেয়া। রোগী পেলেই প্রথম রক্তদান হয়ে যাবে। অনেক আগ্রহ নিয়ে পুরো মেডিকেল খুঁজে ফেললাম, কিন্তু বি পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন এমন কোনো রোগী খুঁজে পাই নি। কি করবো কিছু বুঝতে পারছিলাম না। রক্তদানের ইচ্ছা কি অপুর্ন থেকে যাবে?

হঠাৎ মান্না ভাই বললেন, চৌহাট্টা চল। ওখানে গিয়ে দেখি বি পজিটিভ রক্তের কোনো রিকুয়েস্ট আছে নাকি। যাওয়া মাত্রই শুনি একজন টিউমার অপারেশন রোগীর জন্য বি পজেটিভ রক্ত প্রয়োজন। ব্যাস দিয়ে দিলাম রক্ত। সব মিলিয়ে দিনটা আমার জন্য ছিল স্মরনীয়।

রক্তদাতাঃ Jobayer Bin Amin অভিজ্ঞতাঃ ৪৫ (সূচিপত্র)

২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহ, সারা দেশে তখন হরতাল। রাতে ফোন পেলাম যে নোয়াখালীতে রক্তের প্রয়োজন। আমি থাকি লক্ষীপুরে। এবি নেগেটিভ রক্ত। খুব দুর্লভ, তাই কোথাও রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। আমাকে যেতে হবে। হরতালের মাঝে রিক্সা করে নোয়াখালী গিয়ে রক্ত দিয়ে আসলাম। আসার সময় বিকাল হয়ে যাওয়ায় রিকশার বাতাসে খুব শীত লাগছিল। চৌমুহনী এসে রিকশায় সহযাত্রী নিলাম। হাতে টাকা কম থাকায় সহযাত্রী নিতে হল। শীত লাগাতে শরীরে কাঁপুনি শুরু হল। সহ যাত্রী যখন শুনলো রক্ত দিয়ে এসেছি, তখন সে তার মায়ের জন্য আনা নতুন চাদর বের করে আমার শরীরে জড়িয়ে দিল। চাদরের উষ্ণতায় আস্তে আস্তে কাঁপুনি বন্ধ হল। খুব ভালো লাগলো এই কারণে যে, আমি রক্তদাতা শুনে চাদরটা উনি দিয়েছিলেন।

রক্তদাতাঃ Md Rabiulla Somun অভিজ্ঞতাঃ ৪৬ (সূচিপত্র)

২০১৪ সালের জুন মাসে নরসিংদী থেকে একটা ফোন আসে, ফোনটা করে আরিফ নামের একটা ছেলে যার চাচাত ভাই এর জন্য ২ ব্যাগ ও+ ব্লাড লাগবে। আমি ব্লাড দিতে রাজি ছিলাম না। আমার খুব ভয় লাগছিল। কিন্তু আমি মেডিকেলের স্টুডেন্ট হওয়ায় কিভাবে না করব সেটাও বুঝতে পারছিলাম না। মুখ-লজ্জায় আমি মানা করতে পারলাম না, রাজি হয়ে গেলাম।

সকাল ১০ টা বাজে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে রওনা দিলাম আমি আর আমার এক বন্ধু (এখলাছ)। আমার জানা মতে তার ব্লাড গ্রুপ ও+ ছিল। আমরা চৌরাস্তার বাইপাস থেকে সিএনজি করে গেলাম মিরেরবাজার পর্যন্ত। সেখান থেকে বাসে করে গেলাম বেলাবো পর্যন্ত। মাঝ পথে রেল ক্রসিং এ পরলাম। ড্রাইভার দ্রুত যাওয়ার জন্য রং সাইড দিয়ে চলতে লাগল। যখন রেল লাইনের উপরে উঠলাম তখনি এক লাইনের রাস্তার উপর সামনা দুইটা গাড়ি চলে আসলো। এদিকে দূর থেকে দেখা গেল ট্রেন আসছে। আমরা ভয়ে অস্থির হয়ে গেলাম এই বুঝি জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম আর একদল ড্রাইভারকে বকতে লাগল। ঘটনাক্রমে ট্রেন আসার আগেই বাসটা পার হয়ে গেল কোন রকম ক্ষতি ছাড়া। আমরা সবাই মহান আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। আমি এখলাছকে বললাম একটা ভাল কাজের উদ্দেশ্য যাচ্ছি তাই আল্লাহ তা-আলা আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে।

বেলাবোতে গিয়ে আরিফের চাচার সাথে দেখা হলো। আমরা ওখান থেকে বাসে করে আরো সামনে গেলাম, তারপর একটা সিএনজি নিলাম কিশোরগঞ্জ জহিরুল হক মেডিকেল কলেজ যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আড়াই ঘন্টার পথ। এদিকে হাসপাতাল থেকে ফোনের পর ফোন আসতে লাগল যেকোন মূল্যেই হোক বিকাল ৩ টার আগে ব্লাড দিতে হবে। আমরা ড্রাইভারকে দ্রুত চলার জন্য তাগাদা দিতে লাগলাম। এ দিকে দীর্ঘ ভ্রমন আর ক্লান্তির কারনে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টেরই পেলাম না। হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙ্গল, দেখলাম গাড়ির এক চাকা রাস্তার নিচে পরে গেছে। ড্রাইভার সবাইকে নেমে যাওয়ার তাগাদা দিল। সবাই মিলে টেনে টুনে গাড়িটা রাস্তায় উঠালাম। আমরা যখন হাসপাতালে গেলাম তখন ৩ টার বেশি বেজে গেছে। অনেক টেনশনে আছি, না জানি কি হয়! দ্রুত ব্লাড ব্যাংকের ভিতরে গেলাম। তারা আমার ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করে দেখলো ঠিক আছে কিনা। আমার রক্তের গ্রুপ মিলেছে, কিন্তু এখলাসেরটা মিলেনি।

আমি গেলাম ব্লাড দিতে, ব্লাড দিলাম, তারা আমাদেরকে দুপুরের খাবার খাওয়ালো। চলে আসার জন্য যখন বিদায় নিতে গেলাম তখন রোগীর মা হাসপাতালের ভিতরে আমাকে ঝাপটে ধরে কেঁদে উঠল। বলল, আজ থেকে তুমি আমার আরেক ছেলে। ওদের কান্না দেখে আমারও চোখে পানি এসে গেছে।

সেদিনের পর থেকে ঐ ফ্যামিলির সাথে ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠল। দিনটা ছিল ১৭ জুন, ২০১৪ যেদিন তাসকিন আহমেদ এর অভিষেক হয়েছিল। এরপর থেকে যত বার তাসকিনের খেলা দেখেছি ততবার ঐ দিনটার কথা মনে হয়েছে।

আমার প্রথম রক্তদানের অভিজ্ঞতাটা একটু অন্যরকম। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমার প্রথম রক্তদান করা একটা পরিস্থিতির শিকার হয়ে। সে সময়টা এরকম ছিল এক দিকে ইনজেকশন জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভয়ের, অন্যদিকে একটা পরিবারের ভালবাসার কিছুটা হলেও প্রতিদান দেয়ার সুযোগ।সবচেয়ে বড় কথা হল একটা মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করা।

যাই হোক, মূল কথায় আসি। তখন ২০১০ সাল, আমার খুব ঘনিষ্ট একজন বন্ধুর বোনের একটা অপারেশন হবে ঢাকার এ্যাপোলো হসপিটালে। তাই সে আমাকে তার সাথে ঢাকায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল এবং আমি তার সাথে ঢাকায় গেলাম। হাসপাতাল থেকে অপারেশনের তারিখ নির্ধারণ করে আমাদের দুজন রক্তদাতা যোগাড় করে রাখতে বলা হল। তখনি আমরা পড়লাম সবচেয়ে বড় বিপদের মধ্যে। ঢাকা শহরে রক্তদাতা কোথায় পাব। আমরা তো এখানে কাউকে চিনিনা, এমনকি কোথায় গেলে রক্ত পাওয়া যাবে সেটাও জানিনা। তখন একজন ডাক্তার আমাদের বললেন, “তোমরা আগে নিজেদের রক্তের গ্রুপ টেস্ট করাও, কারো সাথে মিললে সে দিবে আর আরেকটা জোগাড় করবে। দুজনের গ্রুপ মিললে তো আর কোন কথাই নেই। তাই আমরা উনার কথামত ব্লাড গ্রুপিং করালাম এবং আমার গ্রুপের সাথে মিলে গেল।আমিতো খুশির বদলে আরো টেনশনে পড়ে গেলাম, এখনতো আমাকেই দিতে হবে।গ্রুপটা কেন যে আমার সাথে না মিলে ওর ভাইয়ের সাথে মিললো না! তাই কি আর করা শেষমেষ একরকম বাধ্য হয়ে আমাকেই রক্ত দিতে হল।

কিন্তু সবচেয়ে কঠিন হয়ে গেল আরেক ব্যাগ রক্ত জোগাড় করাটা।যাই হোক, অনেক কষ্টের পর আমরা রক্ত জোগাড় করে অপারেশন করালাম আর তখনি আমি বুঝতে পারলাম যে রক্তদানে কোন ক্ষতি হয়না, শুধুমাত্র একটু সাহসের প্রয়োজন। রক্তদান করে যে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায় তা আর কোনভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। তখন থেকেই আমি নিয়মিত রক্তদান করা শুরু করি। মানুষকে রক্তদানে উৎসাহী ও সচেতন করার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছি।এখন পর্যন্ত ১৬ বার রক্তদান করেছি, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সুস্হ শরীরে রাখলে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর রক্তদান করে যাব ইনশাআল্লাহ।

রক্তদাতাঃ মোস্তাকিম সায়মন অভিজ্ঞতাঃ ৪৮ (সূচিপত্র)

আমি একজন রক্তদাতা এবং একজন সেচ্ছাসেবক এইটা আমার সব থেকে বড় পরিচয়। আমি আমার ১১তম রক্তদানের ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আমি সেদিন ক্লাস শেষ করে সবে মাত্র বাসায় এসে বসলাম। ঠিক এমন সময় একটি অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন আসলো,

অপরিচিত লোকঃ ভাই আপনি কি মোস্তাকিম ভাই বলছেন?

আমিঃ জি বলছি। আপনি কে বলছেন?

অপরিচিত লোকঃ ভাই আমি CMH হাসপাতাল থেকে বলছি। আমার বাবার খুব জরুরি A+ রক্তের প্রয়োজন। আপনি কি দিতে পারবেন?

আমিঃ ভাই আপনার বাবার কি সমস্যা? কখন রক্তটা লাগবে?

অপরিচিত লোকঃ ভাই ২টা বাজে। ভাই আপনি একটু আসুন না হলে আমার বাবা কে বাঁচানো যাবে না। আমার বাবার বাইপাস সার্জারি করা হবে।

আমিঃ ভাই, আমি তো থাকি সে পুরান ঢাকা। আসতে তো একটু সময় লাগবে?

অপরিচিত লোকঃ ভাই আপনি আসেন সমস্যা হবে না।

আমিঃ তখন আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ১২.৩০ টা বাজে। আমি বললাম যে ওকে আমি আসছি।

যাই হোক, আমি বেরিয়ে পড়লাম, সাথে দুই বন্ধুকে নিয়ে। বাসে উঠলাম। রোগীর ছেলের আবার ফোন, ভাই আপনি কই? আমি জানালাম যে আমি বাসে উঠলাম।

বাসে বসে আছি। রাস্তায় অনেক জ্যাম। গাড়ি নড়ছে না। রোগীর কথা ভেবে আমরা ৩ জন হাঁটা শুরু করলাম। কাকরাইল মোড় থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত বিশাল জ্যাম। আমি হাঁটছি, হঠাৎ মনে হল আমার ফোন বাজছে। বের করে দেখি লোকটার অনেকগুলো মিসড কল। আমি কল ব্যাক করলাম আর বললাম, "ভাই চিন্তা করবেন না। আমি আসছি।" হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিলাম।

তখন সময় ৩টা আর আমি তখন ফার্মগেটে। অবশেষে আমি ৪টার সময় পৌঁছালাম। যথারীতি ক্রস ম্যাচিং এর জন্য রক্ত দিলাম।

রোগীর ছেলে বললেন, "ভাই, হালকা পাতলা কিছু খেয়ে নেন"।
আমি বললাম, "নাহ। আপনার বাবার আগে রক্ত প্রয়োজন। আগে রক্ত দিই। খাওয়া দাওয়া পরে করা যাবে।"

তখন রোগীর ছেলে বলে, "সমস্যা নাই। আমার বাবার আজকে রক্ত লাগবে না। রক্ত লাগবে কালকে"।

আমি হতবিহ্বল হয়ে উনার দিকে তাকিয়ে রইলাম। খুব জরুরী রক্তের দরকার ছিল জেনে এতদূর হেঁটে এসেছি। এখন বলছে রক্ত লাগবে কালকে!

যাইহোক, কিছু বলিনি। পরে রক্ত দিলাম আর আসার সময় শুধু উনাকে শুধু বললাম, "ভাই, আপনার মিথ্যা বলাটা উচিৎ হয় নাই।"

তারপর বিদায় নিয়ে বের হলাম। আসার সময় সন্ধ্যা ৬.৩০ টা। আবার গাড়ি নাই। আবার শুরু হল আমাদের তিন বন্ধুর হাঁটা।

রক্তদান কথাটা আমার কাছে ছিল অপরিচিত। আমি রক্তদান ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। এমনকি সুচ দেখলে ভয় পেতাম।

কিন্তু একদিন বন্ধু আতিক ফোন দিয়ে বলে, বন্ধু তোমার ব্লাড দিতে হবে। আমি একটু ভয় পাই, অনেক বাহানা করি। আতিক বললো, তুই আয়। আমি ব্লাড দিবো, তুই সাথে থাকবি।
আমার এবং আতিকের গ্রুপের রক্ত একই। সন্ধার দিকে ২ বন্ধু চলে গেলাম ঢাকা মেডিক্যাল। রোগীর আত্মীয় এসে আমাদের মেডিক্যালের ভিতরে নিয়ে গেল।

আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে এখন মনে হয় আমাকে দিয়েই জোর করে রক্ত দেয়াবে। কিন্তু না, দেখলাম আতিক আমাকে কিছু না বলেই আনন্দের সাথে ব্লাড দিতে চলে গেল। দেখে আমারও ব্লাড দেয়ার ইচ্ছা হল। ভাবলাম একটা রোগী পেলে আমি ও ব্লাড দিব। আতিকের ব্লাড দেয়া শেষে আমরা যখন ঢাকা মেডিক্যাল ব্লাড ব্যাংক থেকে বের হচ্ছি তখন লুঙ্গী পরা গ্রামের একজন লোক এসে আমাদের বলছেন, "আমার ও পজিটিভ ব্লাড খুব দরকার। খুঁজে পাচ্ছি না।"

আমি শুনে চুপ করে আছি।

আতিক তখন চাচাকে বলল, "চিন্তা করবেন না। আপনি কাগজ রেডি করে ব্যাগ নিয়ে আসুন। আমার বন্ধু সুজন ব্লাড দিবে।"
আমিও আর মানা করলাম না। রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম জীবনে প্রথম দিব তাই। অবশেষে রক্তদান করে ফেললাম। রক্ত দিয়ে যখন বের হচ্ছিলাম তখন চাচা এসে হাত ধরে কান্না করে দিলেন। আমরাও আর আবেগ ধরে রাখতে পারলাম না। আমাদের চোখও ভিজে উঠলো।

রক্তদাতাঃ Mudassar Ahamed Dpi অভিজ্ঞতাঃ ৫০ (সূচিপত্র)

আমি নারায়ণগঞ্জ থাকি, বাড়ি চাঁদপুর। আমি ২ বার রক্তদান করেছি। আমি যে ২জনকে রক্ত দিয়েছি তাদেরকে আগে চিনতাম না, এখন তাদের সাথে খুব ভাল সম্পর্ক।

রক্তদানের মত মহৎ কাজ করার অনেকবার চেষ্টা করেছি। প্রথম সুযোগ পাইলাম ২২/১০/২০১৬ তারিখে। আমার বড় ভাই সমুদ্র সৈকত তার ফেইসবুকে লিখলেন " একজন মূমূর্ষ রোগীর জন্য ১৬ ব্যাগ ো পজিটিভ রক্ত দরকার ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে"- লিখাটা পড়ে মনে হল এখনই প্রকৃত সময় রক্তদান করার। মাকে বলে গেলাম যে আমি কলেজে যাচ্ছি। হাসপাতালে রোগীর স্বজনরা আমাকে দেখে খুব খুশি হল। তারা আমার সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি মানা করলাম।

তারপর গেলাম রক্ত দিতে। একটু ভয়-ভয় লাগছে। তারপরও মনের মধ্যে সাহস নিয়ে বসে রইলাম। কিছু হালকা খাওয়া-দাওয়া করার পর রক্ত দেয়ার বিছানায় গেলাম। ঐখানে আর একজনের সাথে কথা হল তার বাড়ি নোয়াখালি, সেও আমার মত সেচ্ছায় রক্ত দিতে এসেছে। এটা হতে তাঁর ৯ম রক্তদান। মজার ব্যাপার হল,সে আমার ইয়ারমেট। তখন আমি চিন্তা করলাম আমি তো অনেক পিছিয়ে রয়েছি। ওখানে শুয়েই চিন্তা করলাম যতদিন সুস্থ থাকবো ততদিন রক্ত দিব।

তারপর রক্ত দিলাম তেমন কোন সমস্যা হল না। বাসায় গেলাম। মায়ের ঝাড়ি-বকুনিও খেলাম। তারপরও আমি খুশি। ইনশাআল্লাহ ৪ মাস পর আবার রক্ত দিব। যদি কেউ একবার রক্তদান করতে পারে, সে আর না দিয়ে পারবে না আমি ১০০% কনফার্ম।

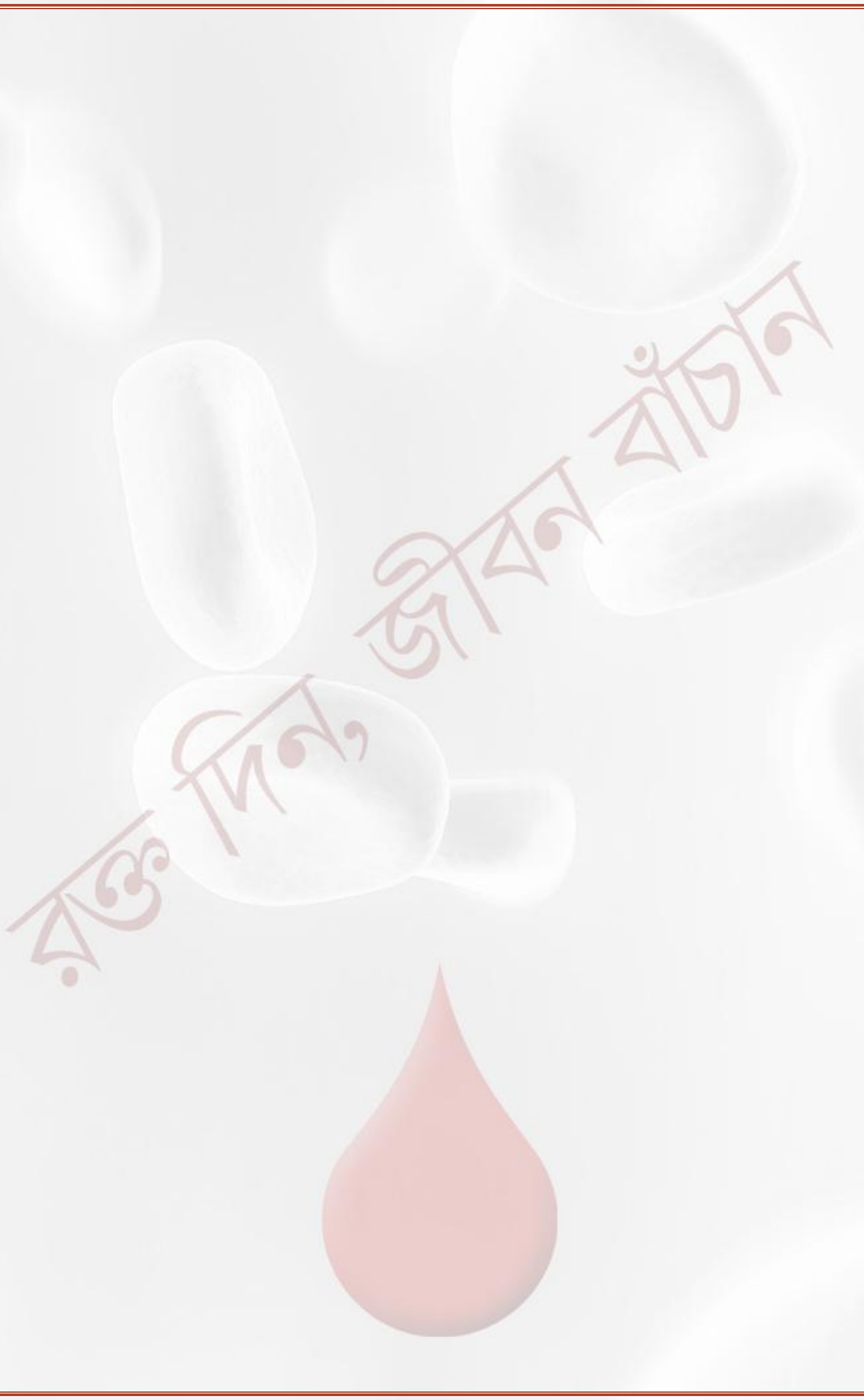
রক্ত দিন জীবন বাঁচান